ভ্রান্তিবিলাস

জাকারিয়া মাসুদ

সূচিপত্র

সম্পাদকের চোখে

কবি বলেছিলেন, ভ্রমকে রুখতে দুয়ারটাকেই বন্ধ করে দিলে সত্যের আলোও ঢুকতে পারে না।

সভ্যতার ইমারতে ইট গাঁথার ব্যাপারটা একটা প্রতিযোগিতার মতো। কোন অংশ ফাঁকা পড়ে থাকলে তাতে কেউ না কেউ কাজ করবেই। এই কাজের সবটাই যে ইমারতের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে তা নয়। কখনো তা একে ভঙ্গুরও করে ফেলে। এই ভঙ্গুরতা রোধ করতে হলে কাজ ফেলে রাখা কোনো সমাধান নয়। বরং সেই ফাঁকা জায়গাগুলো দক্ষ রাজমিস্ত্রীর ন্যায় নিজেদেরই পূর্ণ করতে হবে, যেন অদক্ষ কারিগর কাজের সুযোগ না পায়।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের সাহিত্য ও মননশীল লেখালেখির ধারাটার নিয়ন্ত্রণ কখনোই ইসলামপন্থীরা নিতে পারেনি। সাথে মূলধারার প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ারও। এই নিয়ন্ত্রণটা নিয়েছে মূলত বামপন্থী ঘরানার সেক্যুলাররা। তারা আদর্শের প্রচার-প্রসার করেছে যেখানে যেভাবে পেরেছে। এত বছরের পরিশ্রমে তারা সাধারণ মানুষের চিন্তার একটা ফ্রেইমওয়ার্ক গড়ে তুলতে পেরেছে যেখানে ধর্মমাত্রই অনানুষ্ঠানিকভাবে ব্রাত্য।

এই পরিস্থিতিটা আমরা মুসলিমরা হতে দিলাম। ভ্রম ঢোকার আশঙ্কায় দুয়ারটাকেই রুদ্ধ করে দিয়ে আলো ঢোকার রাস্তাটাও বন্ধ করে দিলাম। ফলে অন্ধকারের অলিগলিতে হাতড়ে বেড়াতে থাকল তরুণ প্রজন্ম। দিশা খুঁজতে চাইল না বেশিরভাগই, যারাও বা চাইল কেউ পেল কমিউনিজমের দেখা, কেউ-বা হারিয়ে গেল লিবারেল মডার্নিজমের চোরাবালিতে।

বামপন্থীরা যে শোষণমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছিল, তা তারা গড়তে চরমভাবে ব্যর্থ। তাদের ক্ষমতার ইতিহাস রক্তচোষার ইতিহাস, দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের লাশের ওপর বেয়নেটের দম্ভের ইতিহাস, বিরোধীমত দমনে নৃশংসতার সীমা হারানোর ইতিহাস।

তবু শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের মাঝে ধর্মমুক্ত পৃথিবী কামনার যে বীজ তারা বপন করে যাচ্ছে, তাতে সার ও পানি দিয়েছেন কয়েকজন প্রভাবশালী সাহিত্যিক। প্রয়াত ড. হুমায়ুন আজাদ এদের অন্যতম। ধর্মকে আদর্শিক প্রতিপক্ষ বানিয়ে যে মনস্তাত্ত্বিক

লড়াই তারা শুরু করেছিল পঞ্চাশের দশকে, সে লড়াইয়ে অন্যতম সারথি তিনি। তাই দেখা যায় ধর্মবিরোধীদের সিংহভাগের কাছেই হুমায়ুন আজাদ এক পূজনীয় ফিগার।

আমরা ময়দান ছেড়ে একপাশে গিয়ে আরাম করতে থাকলাম আর হুমায়ুন আজাদরা একটা একটা করে ইট গেঁথে ইমারত তৈরিতে মন দিল। ঘুম ভেঙে আমরা তাকিয়ে চমকে গেলাম—ইমারত যেন আকাশ ফুঁড়ে উঠতে চাইছে! সেই ইমারতে ঠাঁই নিয়েছে অজস্র তরুণ-তরুণী, আমাদেরই ভাই-বোন।

এসময় মুসলিমদের থেকে দরকার ছিল একদল তরুণের, যারা মিথ্যা আর প্রতারণার ওপর গড়ে তোলা ওই সেক্যুলার ইমারতকে হাতুড়ির আঘাতে আঘাতে ভেঙে সেই ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে সত্যের দালান নির্মাণের চ্যালেঞ্জটা নিতে জানে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা দেখছি আলেমদের থেকে এবং সাথে সাথে সেক্যুলার ব্যাকগ্রাউন্ডদের ভাইবোনদের থেকেও তরুণরা এগিয়ে আসছে, শামিল হচ্ছে এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে। এ লড়াই এখন আর একতরফা নয়, লেখালেখির ময়দানটাকে মিথ্যার উপাসকদের জন্য ছেড়ে দেওয়ার সময়টা আমরা পার করে এসেছি।

প্রিয় ছোটভাই জাকারিয়া মাসুদের *ভ্রান্তিবিলাস* বইটিকে আমি হুমায়ূন আজাদদের গড়ে তোলা সেই ইমারতের দেয়ালে ছোট্ট একটা হাতুড়ির আঘাত হিসেবে দেখছি। ক্ষণিকের প্রতিভাতে এই আঘাত হয়তো তেমন কিছুই নয়। দেয়ালকে তা চূর্ণ করতে পারে না, হয়তো চিড় ধরাতে পারেমাত্র। কিন্তু কে জানে, আল্লাহ চান তো এই চিড় একদিন বিশাল হয়ে দেয়ালটাকেই ধসিয়ে দেবে।

এই বইটি মূলত হুমায়ুন আজাদের বহুল আলোচিত *নারী* গ্রন্থটির রিফিউটেশান। 'রিফিউটেশান' শব্দটা অবশ্য বড় বেশি অ্যাকাডেমিক হয়ে যায়। বলা যেতে পারে, *নারী* বইয়ের মাধ্যমে আজাদের সৃষ্ট কিছু বিভ্রান্তির নিরসন। বইটির পাতায় পাতায় লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ছাপ পাওয়া যাবে। যারা ড. আজাদের মতো লোকেদের আদর্শের উপাসনা করে তারা হয়তো বইটি পড়লে টের পাবে তাদের আদর্শগুরুরা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কতটা অসৎ।

সময়োপযোগী এ বইটির সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি। আল্লাহ ব্যতীত কোনো তৌফিক দেনেওয়ালা নেই।

মুহাম্মাদ জুবায়ের

সম্পাদক, *ভ্রান্তিবিলাস*

শুরুর কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি কিতাব নাযিল করে সত্য ও মিথ্যাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন।

ভ্রান্তিবিলাস আমার দ্বিতীয় বই হিসেবে প্রকাশিত হলেও আদতে এটা প্রথম বই। *সংবিৎ*-এর অনেক আগেই বইটা লিখেছিলাম। ইতোমধ্যে নাস্তিকতা নিয়ে বেশকিছু বই বাজারে চলে আসায়, এটা প্রকাশ করার তেমন আগ্রহ বোধ করিনি। পাণ্ডুলিপিটা অবহেলায় পিসিতেই পড়ে ছিল। কিন্তু যখন দেখলাম এখনো অনেকে হুমায়ুন আজাদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলে, তখন মনে হলো—বইটা প্রকাশ হওয়া দরকার।

ইচ্ছে থাকলেও হুমায়ুন আজাদের সবগুলো অভিযোগ নিয়ে লিখতে পারিনি। যেগুলো আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, সেগুলো নিয়েই কলম ধরেছি। এ বইতে মূলত সরাসরি ইসলামের ওপর আরোপিত অভিযোগগুলোই প্রাধান্য পেয়েছে। এর বাইরে আজাদের আরও কিছু অভিযোগ আছে, যেগুলোর জবাব দিতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সময় স্বল্পতার দরুন আমার পক্ষে সেটা সম্ভব হলো না। আশা করছি অন্য কেউ এই কাজটি সম্পন্ন করবেন।

আজাদের লেখনী পড়ে আমার মনে হয়েছে, ইসলাম নিয়ে সমালোচনা করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান তার ছিল না। দু-একটা ইসলামি বই পড়েই ইসলামকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন তিনি। যার ফলে তার বইতে এমন সব উদ্ভট কথাও স্থান পেয়েছে, যা পড়ে মক্তবের বাচ্চারা পর্যন্ত হাসবে। অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামকে একাকার করে ফেলেছেন তিনি। অথচ ইসলাম গতানুগতিক কোনো ধর্ম নয়। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ইডিওলজি। স্রষ্টার মনোনীত একমাত্র দ্বীন।

আর কথা বাড়াচ্ছি না। যাদের অনুপ্রেরণা ও সহায়তায় বইটা প্রকাশিত হলো, তাদের প্রতি রইল আন্তরিক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। সীমিত সময় এবং তার চেয়েও সীমিত যোগ্যতা নিয়ে লেখা বইতে ভুলত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই কারও চোখে যদি

কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে অবশ্যই আমাদের জানাবেন। ভুল শুধরে নিতে আমরা কার্পণ্য করব না, ইন শা আল্লাহ।

সবশেষে মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন নিজ দয়ায় বইটি কবুল করে নেন। যেদিন ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো কাজে আসবে না, সেদিন যেন একে আমার ও পাঠকদের নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন। আমীন।

আপনাদের ভাই,

জাকারিয়া মাসুদ

১৯ রবিউস সানি, ১৪৪০ হি.

Jakariamasud2016@gmail.com

০১

স্রষ্টা কেন এত ধর্ম পাঠিয়েছেন?

সব ধর্মের অনুসারীরাই দাবি করছে যে, তাদের ধর্মই স্রষ্টা পাঠিয়েছেন। যদি স্রষ্টা একজনই হন, তবে তিনি কেন একাধিক ধর্ম পাঠিয়েছেন? আর যদি স্রষ্টা একটি মাত্র ধর্ম পাঠিয়ে থাকেন, তবে স্রষ্টার মনোনীত সেই ধর্ম কোনটি?

হুমায়ুন আজাদ তার লেখনীর মাধ্যমে কম জ্ঞানসম্পন্ন মানুষদের বিভ্রান্ত করার কিছুটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন—যদি স্রষ্টা একজনই হন, তবে তিনি কেন একাধিক ধর্ম পাঠিয়েছেন? কেন একটি ধর্ম পাঠালেন না?

> *"বহু ধর্ম রয়েছে পৃথিবীতে। একটি সরল প্রশ্ন জাগতে পারে যে বিধাতা যদি থাকেন তিনি যদি একলাই স্রষ্টা হন, তবে তিনি কেনো এতো ধর্ম পাঠালেন। তিনি একটি ধর্ম পাঠালেই পারতেন, এবং আমরা পরম বিশ্বাসে সেটি পালন করতাম। তিনি তা করেন নি কেনো?"*[১]

তার এই অভিযোগের জবাবে আমাদের সরল কথা এটাই, স্রষ্টা পৃথিবীর শুরু থেকে আজ অবধি একটি মাত্র ধর্মই মানবজাতির জন্যে নির্বাচিত করেছেন। আর তা হলো—'ইসলাম'। স্রষ্টার মনোনীত দ্বীনের মৌলিক বিষয়বস্তু যুগে যুগে একই ছিল। যুগে যুগে আল্লাহ্ যত নবি-রাসূলদের পাঠিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষকে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পরিচয় বুঝিয়েছেন, ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য শিখিয়েছেন, জান্নাত-জাহান্নামের কথা তুলে ধরেছেন। তবে বিভিন্ন যুগে নবি-রাসূলদের শারীআতের হুকুম-আহকাম তথা ইবাদাত ও মুআমালাতের (জাগতিক লেনদেন ও অন্যান্য কাজ) পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ,

১. হুমায়ুন আজাদ, *আমার অবিশ্বাস*, অধ্যায় : ধর্ম, পৃষ্ঠা : ১৪৩

পূর্ববর্তী উম্মাতদের জন্যে সম্মানসূচক সিজদা জায়েজ ছিল, কিন্তু আমাদের জন্যে কাউকে সম্মানসূচক সিজদা করা জায়েয নেই। আদম ﷺ-এর সময়ে সহোদর ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ বৈধ ছিল, কিন্তু আমাদের জন্যে তা পুরোপুরি অবৈধ। বানী ইসরাঈলের নারীদের মাসজিদে গমন নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু আমাদের নারীদের জন্যে তা বৈধ। এভাবে পূর্ববর্তী উম্মাতদের সাথে আমাদের অনেক বিধিবিধানের পার্থক্য রয়েছে। এখন প্রশ্ন এই যে, মৌলিক বিষয় একই ছিল কিন্তু শারীআতের প্রকৃতি কেন ভিন্ন ছিল?

এর কারণ এককথায় বলতে গেলে, এটা আল্লাহর হিকমাহ। মানব-সভ্যতা বিকাশের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন স্থান ও জাতির জন্য তৎকালীন মানুষের মানসিক উৎকর্ষ ও সমসাময়িক সমস্যা সমাধানে উপযোগী করে শারীআতের বিধানগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছিল। এমনকি কুরআনের কিছু বিধানকেও ধাপে ধাপে রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। যেমনটা কিবলার দিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। প্রথমদিকে বাইতুল মাকদিস আমাদের কিবলা[২] ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে বিধানকে রহিত করে কাবাকে কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

আল্লাহ ﷻ পূর্ববর্তী কোনো শারীআতকেই সর্বজনীন ও কালোত্তীর্ণ করে পাঠাননি। অন্যদিকে কুরআনের মাধ্যমে দ্বীনকে পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ যে শারীআত পাঠিয়েছেন, তাতে সংযোজন বা বিয়োজনের সুযোগ নেই। আল্লাহ ﷻ বলেন :

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴿٣﴾

“আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।”[৩]

কিন্তু শারীআতের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকল সময়ের জন্যে স্রষ্টার প্রণীত মৌলিক বিধান একই ছিল। এই সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ﴿٣٦﴾

---

২. সালাতের সময় যে দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হয়, তাকে কিবলা বলে।

৩. সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৫

"প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে (মিথ্যা উপাস্য) বর্জন করো।"[৪]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

"আমি তোমার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি প্রত্যেকের প্রতিই এই ওহি করেছি যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত করো।"[৫]

আল্লাহ ﷻ অন্যত্র আরও বলেন :

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴿١٣﴾

"তিনি (স্রষ্টা) তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করেছেন সেই দ্বীন, যা নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে। আর আমি তোমার কাছে যে ওহি পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো—তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং এতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি কোরো না।"[৬]

মহান স্রষ্টার এসব আয়াত আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, স্রষ্টার প্রণীত ধর্ম যুগে যুগে একই ছিল। যে ধর্মের প্রধান আহ্বান ছিল—তাগুতকে অস্বীকার করা, আর আল্লাহ ﷻ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া। আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হয়ে যাওয়া।

স্রষ্টা যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির জন্যে বিভিন্ন নবি ও রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। আর আল্লাহ ﷻ এই কথা পরিষ্কার করেই বলেছেন, তিনি কোনো জাতিকে নবি পাঠানোর

৪. সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৩৬
৫. সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ২৫
৬. সূরা আশ-শুরা, ৪২ : ১৩

মাধ্যমে তাঁর হুকুম ও তাওহিদকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা ব্যতীত শাস্তি দেবেন না।[৭] নবি-রাসূল প্রেরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

"সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে নবিদের পাঠালেন। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিবদমান বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি। কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক বিদ্বেষবশত তারা সেই কিতাব নিয়ে মতভেদ করল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদের হিদায়াত দিলেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।"[৮]

এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহ ﷻ যুগে যুগে তার বান্দাদের সঠিক পথ চেনানোর জন্যে নবি-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। কিতাব নাযিল করেছেন। এসব গ্রন্থে তিনি তৎকালীন সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তাঁর নাযিলকৃত সকল গ্রন্থ ও নবির নাম আমাদের জানা নেই। তবে আল্লাহ ﷻ কুরআন কারীমে ২৫ জন নবির নাম উল্লেখ করেছেন। কুরআনে উল্লেখিত নবিদের নামগুলো হলো—আদম, ইদরিস, নূহ, হুদ, সালিহ, ইবরাহীম, লূত, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইউসুফ,

---

৭. আল্লাহ ﷻ এই প্রসঙ্গে বলেন :

مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

"যে সৎপথে চলে, সে তো নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎপথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে তো নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথ ভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। আর কোনো রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দিই না।" [সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ১৫]

প্রশ্ন জাগতে পারে, ওই সমস্ত এলাকার লোকদের ব্যাপারে সমাধান কী হবে—যাদের এলাকায় কোনো নবি তো দূরের কথা আধুনিক মানুষের পা পর্যন্ত পড়েনি। যেমন : আফ্রিকার, আমাজানের গহীন অরণ্যে বসবাসকারী মানুষ। এই সম্পর্কে শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। এই শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে সবচেয়ে সুন্দরতম অভিমত হচ্ছে—কিয়ামাতের দিন তাদের পরীক্ষা করা হবে। যে ব্যক্তি নির্দেশ মান্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি অমান্য করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। দলিল হচ্ছে—আল্লাহ তাআলার বাণী : "কোনো রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দিই না।" (সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ১৫)। [বিন বায, *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ১/৪৫৬]

৮. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৩১

আইয়ূব, শুয়াইব, মূসা, হারুন, ইউনুস, দাউদ, সুলাইমান, ইলইয়াস, ইলইয়াসা, যুলফিকল, যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, ঈসা ﷺ ও মুহাম্মাদ ﷺ।

❋ প্রসিদ্ধ তিন কিতাব

আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রেরিত নবিদের ওপর অনেক কিতাব নাযিল করেছেন। আল কুরআনে তিনটি কিতাবের কথা বারবার বলা হয়েছে :

১. তাওরাত

২. যাবূর ও

৩. ইনজিল

১. তাওরাত :

কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ ﷻ তাঁর নবি মূসা ﷺ-এর ওপর তাওরাত নাযিল করেছিলেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

"অতঃপর আমি মূসাকে এমন কিতাব প্রদান করেছিলাম, যা ছিল সৎকর্মপরায়ণদের জন্যে পরিপূর্ণতাস্বরূপ, প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ। যাতে তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী হয়।"[১]

আল্লাহ ﷻ অন্যত্র আরও বলেন :

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

"আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে ছিল হিদায়াত ও আলো। এর মাধ্যমে ইহুদিদের ফয়সালা দিতেন অনুগত নবিগণ, আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলিমগণ।

১. সূরা আনআম, ৬ : ১৫৪

কারণ, তাদের আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং এর ওপর তারা সাক্ষী ছিল। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় কোরো না, আমাকে ভয় করো। আর আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ কোরো না। এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।"[১০]

২. যাবুর :

আল্লাহ ﷻ তাঁর নবি দাউদ ﷺ-কে যাবূর প্রদান করেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾

"আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত আছেন, যারা আকাশসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। আমি তো কতক নবিকে কতক নবির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে যাবূর দান করেছি।"[১১]

৩. ইনজিল :

আল্লাহ ﷻ ঈসা ﷺ-এর ওপর ইনজিল নাযিল করেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

"আর আমি তাদের পর মারইয়াম তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। সে তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিল। আমি তাঁকে ইনজিল প্রদান করেছি, যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী আর আল্লাহভীরুদের জন্যে হিদায়াত ও উপদেশবাণী।"[১২]

উপর্যুক্ত আলোচনা আমাদের সামনে এই কথা পরিষ্কার করে দেয় যে, যুগে যুগে আল্লাহ ﷻ মানবজাতির হিদায়াতের জন্যে কিতাব নাযিল করেছেন। সে

---

১০. সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৪৪
১১. সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৫৫
১২. সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৪৬

কিতাবগুলোর প্রত্যেকটির বক্তব্য ছিল—সকল কিছুর গোলামি থেকে নিজেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর বিধানের সামনে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে মুসলিম হয়ে যাওয়া। যত মানবরচিত বিধান আছে তা দূরে ঠেলে, মহান আল্লাহর বিধানের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করা।

এখন আরেকটি প্রশ্ন জাগতে পারে, যদি যুগে যুগে আল্লাহ ﷻ কিতাব নাযিল করে থাকেন, তবে সেগুলোর যেকোনো একটি অনুসরণ করলেই তো হিদায়াতের রাস্তা পাওয়া সম্ভব; আমাদের কেন শুধু কুরআন অনুসরণ করতে হবে? কেবল কুরআনকেই অনুসরণ করার কারণ প্রধানত ৩টি।

১. আল কুরআন ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোর বিকৃতিসাধন।

২. মহান স্রষ্টা কর্তৃক আল কুরআন সংরক্ষণের ওয়াদা।

৩. কুরআন সর্বশেষ নবি ﷺ-এর ওপর নাযিল হওয়া।

❋ ১. আল কুরআন ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোর বিকৃতিসাধন

আল্লাহ ﷻ যুগে যুগে কিতাব পাঠিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রবৃত্তিপূজারিরা তাদের স্বার্থকে টিকিয়ে রাখতে সেই কিতাবের বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন সাধন করেছে। সেসব কিতাবের মধ্যে নিজেদের মতামত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই এখন আর এ সকল কিতাবের বিশুদ্ধতা বজায় নেই। এগুলোতে আল্লাহ ﷻ ও মানুষের বানানো কথার সংমিশ্রণ ঘটেছে। সেখান থেকে কোনটা সৃষ্টিকর্তার কথা আর কোনটি মানুষের কথা, তা আলাদা করার সুযোগ নেই। আল্লাহ ﷻ তাদের এই কুকীর্তির ব্যাপারে বলেন :

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٥

“হে মুসলমানগণ, তোমরা কি আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত, অতঃপর বুঝেশুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল।”[১৩]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ

১৩. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৭৫

ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

"অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ—যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্যে এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে।"[১৪]

আল্লাহ ﷻ অন্যত্র বলেন :

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

"এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। আর তারা জেনেশুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে।"[১৫]

তাদের বিকৃতির একটি নমুনা লক্ষ করুন : ইয়াহুদিরা দাবি করত যে, উটের গোশত হারাম। অথচ এই বিধানটি আল্লাহ ﷻ তাওরাতে প্রদান করেননি। আল্লাহ ﷻ এসব মিথ্যাবাদীদের লক্ষ্য করে বলেন :

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾

"তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলো নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যতীত সমস্ত আহার্য বস্তুই বানী ইসরাঈলের জন্যে হালাল ছিল। তুমি বলে দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ করো।"[১৬]

পূর্ববর্তী কিতাবগুলো বিকৃত হয়ে গেছে, এ দাবি কেবল কুরআনের নয়; অমুসলিম পণ্ডিতরাও এ দাবি করেছেন। এখানে আমরা সেই কিতাবটি নিয়েই আলোচনা করব, যেটাকে খ্রিষ্টানরা আল্লাহর কিতাব (তাওরাত ও যাবূর) বলে দাবি করে থাকে। অর্থাৎ বাইবেলের ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট। তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরুদের একজন হলেন ওরিগন (Origen), যিনি ২৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। তিনি মথি

১৪. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ৭৯

১৫. সূরা আলি-ইমরান, ৩ : ৭৮

১৬. সূরা আলি-ইমরান, ৩ : ৯৩

বর্ণিত বাইবেলের একটি ব্যাখ্যা রচনা করেন, যা *Commentary on Matthew* নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। সেখানে তিনি লেখেন,

> "The differences among the manuscripts have become great, either through the negligence of some copyist or through the perverse audacity of others; they either neglect of check over what they have transcribed, or, in the process of checking. The make additions or deletions as the please."[১৭]

> "এক পাণ্ডুলিপি থেকে আরেক পাণ্ডুলিপির মধ্যে বড় ধরনের অসামঞ্জস্য ধরা পড়েছে। এর কারণ হতে পারে অনুলিপিকাররা যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দেননি, অথবা কিছু লোক জেনেবুঝেই পরিবর্তনের ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। মোটকথা, হয় তারা প্রতিলিপি তৈরির সময় ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করেনি, অথবা নিরীক্ষণের সময় ইচ্ছেমতো সংযোজন-বিয়োজন করেছেন।"

খ্যাতনামা বাইবেল-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর বার্ড ইহরম্যান বলেন,

> "Scholars differ significantly in their estimates-some say there are 200,000 variants known, some say 300,000, some say 400,000 or more! We do not know for sure because, despite impressive developments in computer technology, no one has yet been able to count them all. Perhaps, as I indicated earlier, it is best simply to leave the matter in comparative terms. There are more variations among our manuscripts than there are words in the New Testament."[১৮]

> "পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ কত—তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মতভেদ করেছেন। কারও মতে ২ লক্ষ, কারও মতে ৩ লক্ষ, এমনকি কেউ কেউ তো বলেছেন ৪ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে! নিশ্চিতভাবেই সঠিক সংখ্যাটা আমাদের অজানা। কারণ, কম্পিউটার প্রযুক্তির অসাধারণ অগ্রগতি হলেও এখন পর্যন্ত কেউ সবগুলো বৈপরীত্য গুণে শেষ করতে পারেনি। তাই আমার মতে ব্যাপারটা তুলনামূলক অর্থে ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। নিউ টেস্টামেন্টে মোট যতগুলো শব্দ আছে, আমাদের পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে বৈপরীত্যের সংখ্যা বরং তার চেয়েও বেশি!"

১৭. Origen, *Commentary on Mattew,* 15.14; cited in Ehrman, b, Misquoting Jesus: Story Behind Who Changed the Bible and Why, (New York, 2007).

১৮. Origen, *Commentary on Mattew,* 15.14; cited in Ehrman, b, Misquoting Jesus: Story Behind Who Changed the Bible and Why, (New York, 2007).

❋ ২. মহান স্রষ্টা কর্তৃক আল কুরআন সংরক্ষণের ওয়াদা :

আল্লাহ ﷻ অন্য কোনো কিতাবকে কিয়ামাত পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখবেন বলে ওয়াদা করেননি। পূর্ববর্তী সময়ে যতগুলো কিতাব এসেছিল, মানুষ সবগুলোরই বিকৃতি সাধন করেছে। তাই এগুলো থেকে মানবজাতির হিদায়াতের পথ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু কুরআন হলো এর ব্যতিক্রম। আল্লাহ ﷻ কুরআনের বেলায় এই ওয়াদা প্রদান করেছেন যে, তিনি এই কিতাবকে সংরক্ষণ করে রাখবেন।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝٩

"আমি এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।"[১৯]

এখানে একটি বিষয় ক্লিয়ার করে নেওয়া প্রয়োজন—কেন আল্লাহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করলেন না? আসলে এর জবাব ওপরেই রয়েছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো নাযিল হয়েছিল নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্যে। অন্যান্য কোনো ধর্মগ্রন্থই কিয়ামাত পর্যন্ত মানুষের জীবন-বিধান হিসেবে পাঠানো হয়নি। যখন সেগুলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে প্রেরিত হয়েছে, তখন তার বিশুদ্ধতা রক্ষা করার কী প্রয়োজনীয়তা আছে? আর যখন সে সময়ও গত হয়ে গেছে এবং সে সকল কিতাব রহিতকারী কুরআন নাযিল হয়েছে, তখন সেগুলোর কীই-বা দরকার আছে?

❋ ৩. কুরআন সর্বশেষ নবি ﷺ-এর ওপর নাযিল হওয়া :

আমরা যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নিই যে, পূর্ববর্তী কিতাবগুলো বিকৃত হয়নি; তবুও আমাদের জন্যে ওগুলো মানা আবশ্যক নয়। অনেক ক্ষেত্রে মানাটা জায়েযও নয়।[২০]

---

১৯. সূরা আল-হিজর, ১৫ : ৯

২০. একবার উমার رضي الله عنه তাওরাতের একটি পাণ্ডুলিপি এনে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, এটা হলো তাওরাতের একটি পাণ্ডুলিপি। উমার رضي الله عنه-এর কথা শুনে আল্লাহর রাসূল চুপ থাকলেন। এরপর উমার رضي الله عنه তাওরাত পড়তে আরম্ভ করলেন। (এদিকে রাগে) রাসূল ﷺ-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হতে লাগল। আবু বাকর رضي الله عنه বললেন, "উমার, তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবর্ণ চেহারা মুবারক দেখছ না?" আবু বাকর رضي الله عنه-এর কথা শুনে উমার رضي الله عنه রাসূল ﷺ-এর দিকে তাকালেন। এরপর বললেন, "আমি আল্লাহর গযব ও রাসূল ﷺ-এর ক্রোধ হতে পানাহ চাচ্ছি। আমি রব হিসেবে আল্লাহ তাআলার ওপর, দ্বীন হিসেবে ইসলামের ওপর এবং নবি হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর সন্তুষ্ট আছি। উমার رضي الله عنه-এর কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, "আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! যদি (তাওরাতের নবি) মূসা তোমাদের মধ্যে থাকতেন আর তোমরা তাঁর অনুসরণ করতে আর আমাকে ত্যাগ করতে, তাহলে তোমরা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। মূসা যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুওয়তের যুগ পেতেন, তাহলে তিনিও অবশ্যই আমার অনুসরণ করতেন।" [*মিশকাতুল মাসাবীহ,* অধ্যায় : ঈমান, হাদীস নং : ১৯৪]

কেননা, পূর্বের ধর্মগ্রন্থগুলো ছিল সেই সময়ের জন্যে। যখন সেই সময় বিলীন হয়ে গেছে, তখন আর ওই সব ধর্মগ্রন্থের কী প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে? কুরআন কারীমের পূর্বে যে ধর্মগ্রন্থগুলো নাযিল হয়েছিল, সেগুলোতে তৎকালীন জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের ওপর লক্ষ রাখা হয়েছে। আর তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে সমসাময়িক পরিস্থিতি অনুযায়ী দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল।

এই ব্যাপারটা কিন্তু কেবল পূর্ববর্তী শারীআতের জন্যই প্রযোজ্য নয়। কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের জীবনজুড়ে প্রয়োজন অনুসারে কখনো এক আয়াত, কখনো আয়াতের একটি অংশ, আবার কখনো একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা—এভাবে ধাপে ধাপে নাজিল হয়েছে। শারীআতের হুকুম-আহকামগুলোও ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে। যখন আল্লাহ ﷻ নতুন বিধান দ্বারা দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলেন তখন আর পূর্বের বিধান প্রযোজ্য হবে না, যদি তা কুরআনে থাকে তবুও। যেমন : ধরা যাক মদ নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারটা। রাসূল ﷺ-এর নবুয়তি জীবনের শুরুর দিকে মদকে হারাম করা হয়নি। ধাপে ধাপে তা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমদিকে সাহাবিরা যখন মদ সম্পর্কে জানতে চান, তখন আল্লাহ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴿٢١٩﴾

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে? বলে দাও, এ দুটোর মধ্যে আছে গুরুতর পাপ। অবশ্য লোকদের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে। কিন্তু এ দুটোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক গুরুতর।"[২১]

কিন্তু পরবর্তীকালে মদ্যপান করে শুধু সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়। আল্লাহ ﷻ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴿٤٣﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাকো তখন নামাযের ধারেকাছেও যেয়ো না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ; আর (নামাযের

২১. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২১৯

> কাছে যেয়ো না) ফরয গোসলের অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও।"[২২]

একটা সময়ে এই বিধানকে রহিত করে দিয়ে চিরদিনের জন্যে মদকে হারাম করা হয়। আল্লাহ ﷻ বলেন :

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

> "হে মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব তোমরা এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।"[২৩]

এখন যদি কেউ পূর্বে নাযিলকৃত আয়াত দিয়ে মদকে হালাল করতে চায়, তবে সেটা অবশ্যই নির্বোধের কাজ হবে। কেননা, মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে পূর্বের আয়াতটি রহিত করে দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী কিতাবগুলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবতীর্ণ হলেও আল কুরআন কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। কিয়ামাত পর্যন্ত মানুষের জীবনব্যবস্থা হিসেবে কুরআন পাঠানো হয়েছে। এই কিতাবে এমনভাবে মূলনীতি বিবৃত হয়েছে যে, কিয়ামাত পর্যন্ত যেকোনো উদ্ভূত সমস্যায় এখান থেকে দিকনির্দেশনা খুঁজে বের করা সম্ভব। আর মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন সমস্ত বিশ্বের নবি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, তাঁর পূর্বে আর কোনো নবিই তার ওপর অবতীর্ণ কিতাবের সর্বজনীনতা দাবি করেননি। বরং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষ ছাড়া তার কিতাব বা ধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। এ জন্যে ইসলাম ছাড়া অধিকাংশ প্রচলিত ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মকে সার্বজনীন বলে দাবি করে না। বর্তমানকালে খ্রিষ্টানগণ তাদের ধর্মকে সর্বজনীন বলে দাবি করে থাকে। অথচ তাদের তাদের মধ্যে বিদ্যমান বাইবেলে যিশু বারবার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কেবল বানী ইসরাঈলের জন্য নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। অন্য কোনো গোত্রের জন্য নয়। যিশু বলেছেন,

> "বিজাতিদের পথে চলিও না; বরং ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষদের কাছে যাও। আর যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, স্বর্গ-রাজ্য নিকটবর্ত্তী।"[২৪]

---

২২. সূরা আন-নিসা, ৪ : ৪৩

২৩. সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৯০

২৪. বাইবেল, নতুন নিয়ম, মথি : ১০/৬

তিনি আরও বলেছেন,

> "ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।"[২৫]

❋ একমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত দ্বীন

তাই আমাদের জীবন পরিচালনার একমাত্র মাধ্যম হবে—কুরআন এবং কুরআন যে দ্বীনকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, সে দ্বীন। আর কুরআন কেবল একটি মাত্র দ্বীনকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, তা হলো 'ইসলাম'। আল্লাহ ﷻ বলেন :

> ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ

> "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"[২৬]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেছেন :

> وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

> "যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে কিছুতেই তা গ্রহণ করা হবে না। আর আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[২৭]

ইসলামকে আল্লাহ একমাত্র মনোনীত দ্বীন হিসেবে নির্বাচন করেছেন। ইসলামের মৌলিক বিধিবিধানকে তিনি নিজে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোনো মুসলিমের পক্ষেই তাঁর ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিধানের বাইরে সিদ্ধান্ত দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। যেকোনো বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান গ্রহণ করার সুযোগ নেই। আর মানুষ হিসেবে সবার ওপর ইসলাম গ্রহণ করা আবশ্যক। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না। ইসলাম ছাড়া অন্য রীতিনীতির অনুসরণ করে পরকালীন মুক্তি লাভ করা যাবে না।

---

২৫. বাইবেল, নতুন নিয়ম, মথি : ১৫/২৪

২৬ সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ৩

২৭ সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৮৫

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ বলেছেন,

> “সকল নবি দ্বীন ইসলাম সহকারে প্রেরিত হয়েছেন। ইসলামই একমাত্র এমন দ্বীন, যা ছাড়া অন্য কোনো দ্বীনকে আল্লাহ কখনোই গ্রহণ করবেন না—পূর্ববর্তীদের থেকেও না, পরবর্তীদের থেকেও না।”[২৮]

❋ সব নবিই মুসলিম ছিলেন

আজাদ তার বইতে এ কথাও বলেছেন যে, প্রতিটি ধর্মই নিজেকে নতুন বলে দাবি করে। আর মক্কার প্রচলিত ধর্ম থেকেই নাকি ক্রমান্বয়ে ইসলাম বিকশিত হয়!

> “তবে প্রতিটি ধর্মই নিজেকে নতুন বলে দাবি করে... মক্কায় প্রচলিত পৌত্তলিক আরবদের ধর্ম থেকে বিকশিত হয় ইসলাম।”[২৯]

আমরা আমাদের আলোচনার দ্বারা বুঝিয়েছি যে, ইসলাম কখনোই নিজেকে নতুন বলে দাবি করেনি। বরং ইসলাম বারবার উল্লেখ করেছে, এই দ্বীন পূর্ববর্তী নবিগণেরই দ্বীন। তাঁরা যে দ্বীন প্রচার করেছেন, সেই দ্বীন। তারা যে কথার দাওয়াত দিয়েছেন, ইসলামও ঠিক একই কথার দাওয়াত দেয়। আল্লাহ ﷻ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেন :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

> “অতঃপর তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মতাদর্শ অনুসরণ করো। আর সে তো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।”[৩০]

ইসলাম শব্দটি আরবি ‘সিলমুন’ শব্দ থেকে গৃহীত। ইসলাম মানে হলো আল্লাহর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করা এবং অনুগত হওয়া। আর মুসলিম বলা হয় যারা ইসলামকে মেনে চলে। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাকে স্রষ্টার ইচ্ছার সামনে যে সমর্পণ করে, সে-ই হলো মুসলিম। আর যুগে যুগে প্রত্যেক নবিই মুসলিম ছিলেন। সকল নবিই ইসলাম ধর্মের প্রচারক ছিলেন। যেমন, আল্লাহ ﷻ ইবরাহীম ﷺ সম্পর্কে বলেন :

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ

২৮ ইবনু তাইমিয়্যা, তাকীউদ্দীন আহমাদ ইবনু আবদিল হালীম, *আল-উবুদিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১১১
২৯. হুমায়ুন আজাদ, *আমার অবিশ্বাস*, অধ্যায় : ধর্ম, পৃষ্ঠা : ৯৬
৩০. সূরা আন-নাহল, ১৬ : ১২৩

الْمُشْرِكِينَ ۝

"ইবরাহীম ইহুদি ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন 'হানীফ' (অর্থাৎ, সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং মুসলিম) এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না।"[৩১]

আজাদ বলেছেন, মক্কার প্রচলিত মুশরিকদের ধর্ম-বিশ্বাস থেকে বিকশিত হয় ইসলাম! অথচ আমরা কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণাতে দেখতে পাই যে, কোনো নবিই মুশরিকদের অনুসারী ছিলেন না। মুশরিকদের কর্মের সমর্থনদাতা ছিলেন না। বরং সবাই মুসলিম ছিলেন, ইসলামের অনুসারী ছিলেন। সবাই শিরকের বিরোধিতা করেছেন। আমরা এও জানি যে, ইসলাম এসে মক্কার পৌত্তলিকদের সকল জাহিলি বিধানকে বাতিল ঘোষণা করে। জাহিলি যুগের মূর্তিপূজা, রক্তপাত, নারীদের প্রতি অবিচার, মদ, জুয়া, কন্যাশিশু হত্যা, পারস্পরিক বিবাদ, বেহায়াপনা ইত্যাদি সবকিছুকে চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়। মহানবি ﷺ বিদায় হজের ভাষণে বলেন,

"তোমাদের রক্ত এবং ধন-সম্পদ পরস্পরের জন্যে আজকের দিন, বর্তমান মাস এবং বর্তমান শহরের মতোই নিষিদ্ধ। শোনো, জাহিলি যুগের সবকিছু আমার পদতলে পিষ্ট করা হয়েছে। জাহিলিয়াতের খুনও খতম করে দেওয়া হয়েছে।"[৩২]

তাই ইসলাম মক্কার পৌত্তলিকদের কাছ থেকে বিকশিত হয়েছে, এই দাবি আমাদের কাছে বেশ হাস্যকর।

---

৩১. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৬৭
৩২. মুবারকপুরি, শফিউর রহমান, *আর রাহীকুল মাখতুম*, পৃষ্ঠা : ৪৯৭

০২

জান্নাতে নারীর অবস্থান

জান্নাতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন—যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে।"[৩৩]

রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীসে বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন,

"মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্যে এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও হয়নি। এ কথার স্বপক্ষে আল্লাহর কিতাবের বাণী রয়েছে : "কোনো প্রাণী জানে না যে, জান্নাতবাসীদের জন্যে কত চোখ জুড়ানো নিয়ামত গুপ্ত রাখা হয়েছে ওসব সৎ কাজের প্রতিদানস্বরূপ, যা তারা দুনিয়াতে করেছিল।"(সূরা আস-সাজদা, ৩২ : ১৭)।"[৩৪]

মহান আল্লাহর বাণী ও নবি ﷺ-এর হাদীস দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, জান্নাতের

---

৩৩. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৩৩

৩৪. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : তাফসীর অধ্যায়, ৮/৪৪১৭, ৪৪১৮; মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : বেহেশত ও তার অধিবাসী..., ৮/৬৯২৮-৬৯৩১; ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার, *তাফসীরুল কুরআনীল আযীম,* ১৫/৭১৭-৭১৮; আলবানি, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, *হাদীসে কুদসি সমগ্র,* পৃষ্ঠা : ৭১

নিয়ামত মানুষের দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কেননা, জান্নাতে আল্লাহ তা-ই দেবেন, যা জান্নাতীরা চাইবে। সেখানে নারীরা যা চাইবে, তাদের তা-ই দেওয়া হবে। আর পুরুষরা যা চাইবে, তাদেরও তা-ই দেওয়া হবে। জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত ও জান্নাতের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে যেমন সম্ভব না, তেমনই আমাদের উদ্দেশ্যও তা না। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, হুমায়ুন আজাদের ভিত্তিহীন অভিযোগ। আজাদ বলেন,

"বেহেশত পুরুষের বিলাসস্থল, সেখানে পার্থিব নারী বা স্ত্রীদের স্থান নেই। পৃথিবীতে তারা চুক্তিবদ্ধ দাসী স্বর্গে তারা অনুপস্থিত বা উপেক্ষিত। ইসলামি আইনে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই।"[৩৫]

তার অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা আলোচনাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছি :

১. পার্থিব স্ত্রীরা কি জান্নাতে অনুপস্থিত?

২. জান্নাতে পার্থিব নারীদের মর্যাদা কেমন হবে?

৩. জান্নাতী নারীদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা কী হবে?

❋ ১. পার্থিব স্ত্রীরা কি জান্নাতে অনুপস্থিত?

একটি আয়াত খেয়াল করুন, আল্লাহ ﷻ বলেন :

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

"স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী, ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও এবং ফিরিশতাগণ তাদের নিকট প্রবেশ করবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। এবং বলবে, তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি। কত উত্তম এই পরিণাম।"[৩৬]

আয়াতটির তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম ইবনু কাসীর ؒ লিখেছেন,

"সেই উত্তম পরিণাম এবং উত্তম ঘর হচ্ছে জান্নাত, যা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, জান্নাতে একটি প্রাসাদের

৩৫. *নারী*, পৃষ্ঠা : ৮৪

৩৬. সূরা আর-রাদ, ১৩ : ২৩-২৪

নাম 'আদন'। তাতে মিনার ও কক্ষ রয়েছে। তাতে রয়েছে পাঁচ হাজার দরজা। প্রত্যেক দরজার ওপর পাঁচ হাজার ফিরিশতা। ওই প্রাসাদটি নবি, সিদ্দিক ও শহীদদের জন্যে নির্দিষ্ট। যাহহাক ﷺ বলেন যে, এটা জান্নাতের শহর। এতে থাকবেন নবিগণ, শহীদগণ এবং হিদায়াতের ইমামগণ। তাদের আশেপাশে অন্যান্য লোকেরা থাকবেন। ওর চতুর্দিকে অন্যান্য জান্নাত রয়েছে। ওখানে তারা তাদের প্রিয়জনকেও তাদের সাথে দেখতে পাবে। তাদের সাথে থাকবে তাদের মুমিন পিতা, মাতামহ, পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী ইত্যাদি আত্মীয়স্বজন। তারা সুখে-শান্তিতে অবস্থান করবেন এবং তাদের চক্ষুগুলো ঠান্ডা হবে। এমনকি তাদের মধ্যে কারও কারও আমল যদি তাকে ওই উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাবার যোগ্যতা নাও রাখে, তবুও আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন এবং ওই উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেবেন। যেমন, মহান আল্লাহ ﷻ বলেন : "এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সঙ্গে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী।"[৩৭] তাদের মুবারকবাদ ও সালাম জ্ঞাপনের জন্যে সদাসর্বদা প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে ফিরিশতাগণ যাতায়াত করবেন। এটাও আল্লাহ তাআলার একটি নিয়ামত। এর ফলে তারা সব সময় খুশি থাকবেন এবং সুসংবাদ শুনবেন। এটা ফেরেশতাদের সৌভাগ্যের কারণ যে, তারা শান্তির ঘরে নবি, সিদ্দীক ও শহীদদের সংস্পর্শে থাকতে পাবেন। এতে তারা নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করবেন।"[৩৮]

মুফতি মুহাম্মাদ শফি ﷺ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,

"এরপর তাদের জন্যে আরও একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তাআলার এই নিয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী-সন্তানেরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদের উপযুক্ত হতে হবে। এর ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপ-দাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব আমল যদিও এ স্তরে পৌঁছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে তাদেরকেও এই উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। এরপর আরও একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফিরিশতারা তাদের সালাম করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে, 'সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখ কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের

৩৭. সূরা আত-তুর, ৫২ : ২১
৩৮ ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনীল আযীম* : ১২/২৯৬

কতই-না উত্তম পরিণাম।'"[৩৯]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

"এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সঙ্গে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করব না; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী।"[৪০]

ইমাম ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

"আল্লাহ তাআলা নিজের ফযল ও করম এবং স্নেহ ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন, যেসব মুমিনের বাপ-দাদারা ঈমানের ব্যাপারে বাপ-দাদাদের অনুসারী হয়, কিন্তু সৎকর্মের ব্যাপারে তাদের পিতৃপুরুষের সমতুল্য হয় না, আল্লাহ তাআলা তাদের সৎ আমলকে বাড়িয়ে দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের সমপর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবেন। যাতে পূর্বপুরুষরা তাদের উত্তরসূরিদের তাদের পার্শ্বে দেখে শান্তি লাভ করতে পারে। আর উত্তরসূরিরাও যেন পূর্বসূরিদের পার্শ্বে থাকতে পেরে সুখী হতে পারে। মুমিনদের আমল কমিয়ে দিয়ে যে তাদের সন্তানদের আমল বাড়িয়ে দেওয়া হবে, তা নয়; বরং অনুগ্রহশীল ও দয়ালু আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ ভান্ডার হতে তা দান করবেন। এই বিষয়ে মারফু হাদীসও আছে। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে চলে যাবে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সেখানে দেখতে পাবে না, তখন তারা আরয করবে, 'হে আল্লাহ, তারা কোথায়?' উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তারা তোমাদের মর্যাদায় পৌঁছাতে পারেনি'। তারা তখন বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তো নিজেদের জন্যে ও সন্তানদের জন্যে নেক আমল করেছিলাম!' তখন মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে এদেরও ওদের সম-মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। এও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীদের যেসব সন্তান ঈমান আনয়ন করেছে তাদের তো তাদের সাথে মিলিত করা হবেই, এমনকি তাদের যেসব সন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।"[৪১]

---

৩৯. মুহাম্মাদ শফি, *পবিত্র কুরআনুল কারীম : বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর*, পৃষ্ঠা : ৭০৪

৪০. সূরা আত-তুর, ৫২ : ২১

৪১. ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনীল আযীম* : ১৭/১২০-১২১

আরেকটি আয়াত ও তার তাফসীর বর্ণনা করেই আমরা মূল আলোচনায় চলে যাব ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ ﷻ বলেন :

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾

"তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো।"[৪২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু কাসীর ﵀ লিখেছেন,

"ইরশাদ হচ্ছে, কিয়ামতে দিন মুত্তাকীদের বলা হবে, হে আমার বান্দাগণ, আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না—যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে—তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো। এটা হলো তোমাদের ঈমান ও ইসলামের প্রতিদান। অর্থাৎ ভেতরে বিশ্বাস ও পূর্ণ প্রত্যয়, আর বাইরে শারীআতের ওপর আমল। মু'তামার ইবন সুলাইমান স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন যখন মানুষ নিজ নিজ কবরে উত্থিত হবে, তখন সবাই অশান্তি ও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা (আল্লাহর বাণী) করবে, 'হে আমার বান্দাগণ, আজ তোমাদের কোনো ভয় নাই এবং দুঃখিতও হবে না তোমরা।' এ ঘোষণা শুনে সবাই খুশি হয়ে যাবে, কারণ এটাকে সাধারণ ঘোষণা মনে করবে। এরপর আবার ঘোষণা করা হবে, যারা আমার আয়াত বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে। এ ঘোষণাটি শুনে খাঁটি ও পাকা মুসলমান ছাড়া অন্যান্য সবাই নিরাশ হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের বলা হবে, তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ করো।... আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সর্বনিম্ন শ্রেণির জান্নাতীর সাততলা প্রাসাদ হবে। সে ষষ্ঠ তলায় অবস্থান করবে এবং সপ্তম তলাটি তার ওপরে থাকবে। তার ত্রিশজন খাদেম থাকবে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় স্বর্ণনির্মিত তিন শ পাত্রে তার জন্যে খাদ্য পরিবেশন করবে।... দুনিয়ার স্ত্রী তো থাকবেই, পাশাপাশি আয়তনয়না হুরদের মধ্য হতে তার বাহাত্তরজন স্ত্রী থাকবে। তাদের মধ্যে একজন এক এক মাইল জায়গার মধ্যে বসে থাকবে।'"[৪৩]

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, যেসব নেককার স্বামীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের নেককার স্ত্রীরাও তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুনিয়ার

---

৪২. সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩ : ৭০

৪৩. ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনীল আযীম* : ১৬/৫৯৭-৫৯৮, [আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণিত হাদীসটি ইমাম আহমাদ ﵀ তাঁর *মুসনাদ* (২/৫৩৭)-এ বর্ণনা করেছেন—শারঈ সম্পাদক]

স্ত্রীরা যদি সমপর্যায়ে পৌঁছাতে নাও পারে, তবুও আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেবেন। স্বামী-স্ত্রীকে একসাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ করে দেবেন। আর জান্নাতী হুরদের তুলনায় দুনিয়ার পুণ্যবতী স্ত্রীর জায়গা আলাদা সম্মানজনক জায়গায় হবে। আর শুধু স্ত্রীই নয়; আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে জান্নাতীদের সন্তান-সন্ততিসহ, বাবা-মা, দাদা-দাদি, পৌত্রদেরও তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেবেন। সবাইকে একসাথে থাকার সুযোগ করে দেবেন।

কাজেই এরপরেও যদি কেউ বলে, পার্থিব নারীরা জান্নাতে অনুপস্থিত, কিংবা নারীরা দুনিয়ায় চুক্তিবদ্ধ দাসী আর জান্নাতে অবহেলিত; তবে আমাদের বলতেই হয়—তার জানাশোনার ঘাটতি আছে। ইসলাম সম্পর্কে সে মক্তবের বাচ্চাদের থেকেও কম জ্ঞান রাখে।

❋ ২. জান্নাতে পার্থিব নারীদের মর্যাদা

ইসলাম কি পার্থিব নারীদের জান্নাতী হুরদের থেকে কম সম্মানিত করেছে? এর উত্তর, অবশ্যই না। উম্মে সালামা ﵂ বলেন,

> "আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, বলুন যে, পার্থিব নারীরা উত্তম না জান্নাতের হুরেরা?' তিনি ﷺ বললেন, 'বরং পৃথিবীর নারীরা হুরদের দেয়ে উত্তম। যেমন কাপড়ের বাইরের দিকটি ভেতরের দিক অপেক্ষা উত্তম।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, কেন?' তিনি ﷺ বললেন, 'তাদের সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদাতের কারণে; যা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকে।'"[৪৪]

এই হাদীস অত্যন্ত পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, পার্থিব নারীর মর্যাদা হুরদের চেয়েও বেশি। কেননা, যুগে যুগে আজাদের মতো লোকেরা তাদের স্রষ্টার পথ থেকে সরিয়ে নিতে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছে। কিন্তু তারা বিভ্রান্ত লোকদের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করে, দুনিয়ায় সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। রবের হুকুমের সামনে নিজেদের মস্তক সদা অবনত করে রেখেছে। বিশুদ্ধ ঈমান বক্ষে ধারণ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তাই এই সব মহীয়সী-গরীয়সী নারীদের মর্যাদা জান্নাতী হুরদের চেয়েও দামি হয়ে গেছে। কোনো কোনো সাহাবির উক্তি থেকে এও জানা যায়, আল্লাহর ইবাদাতের অনুপাতে দুনিয়ার স্ত্রীগণ জান্নাতে ডাগরচোখা হুরদের চেয়েও দেখতে অনেক সুন্দরী হবে। তাদের মর্যাদা এত বেশি থাকবে যে,

৪৪. হাইসামি, নূরুদ্দীন আলি ইবনু আবী বাকর, *মাজমাউয যাওয়াইদ* : ১০/৪১৭-৪১৮

ইমাম ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন, 'জান্নাতে প্রত্যেক অধিবাসীর জন্যে অন্যের স্ত্রীদের কাছে ঘেঁষাও নিষিদ্ধ থাকবে'।[৪৫]

❋ ৩. জান্নাতী নারীদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা

আজাদ এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলামে নারী হলো পুরুষের ভোগ্য পণ্য। চুক্তিবদ্ধ দাসী। ব্যক্তি হিসেবে পুরুষ তার প্রভু, আর সে কেবল ভোগের সামগ্রী। কেননা, একদিকে পুরুষকে দুনিয়ায় বহুবিবাহের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে জান্নাতে হুরের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু নারীর জন্যে এই ধরনের কিছু ঘোষিত হয়নি। হুমায়ুন আজাদ বলেন,

> *"পুরুষ ও নারী ইসলামে ব্যক্তি হিসেবে প্রভু ও দাসী... নারী দাসী, তবে সম্ভোগের বস্তুও। সব রকম সম্ভোগের চূড়ান্তরূপ হচ্ছে নারী সম্ভোগ; এবং এ ধর্মেও নারীকে নির্দেশ করা হয়েছে কামসামগ্রীরূপে; পুরুষের কামকে পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, আর নারীর কামকে করে দেয়া হয়েছে নিষিদ্ধ... সারকথা হচ্ছে নারী অবাধ্য, অশুভ, ও কামুক। তবে নারী তার কাম চরিতার্থ করতে পারবে না, পুরুষ নারীতে চরিতার্থ করবে কাম। পুরুষের কামসামগ্রীর চূড়ান্ত রূপ ধরেছে হুর-এ।"[৪৬]*

> *"ইসলামে কামসামগ্রীর চরম রূপ হুর। পুরুষের কামকল্পনার চূড়ান্ত রূপ ধরেছে হুর-এ, হুররা চূড়ান্ত যৌনাবেদনময়ী নারী, যাদের দেহ হচ্ছে পুরুষের আদিম কামকল্পনার প্রতিমূর্তি।"[৪৭]*

■ তাদের ইচ্ছার ভিন্নতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে

একটু আগেই দেখেছি, জান্নাতী নারীরা স্বামীদের সাথে মিলিত হবে। আর জান্নাতে তাদের সকল চাওয়াকে পূর্ণ করা হবে। কীভাবে তাদের চাওয়াকে পূর্ণ করা হবে, এই বিষয়ে আলোচনা শুরুর আগে একটি জিজ্ঞাসা, কোনো পুরুষকে যদি বলা হয়, ইসলামের হারামকৃত কোন বিষয়ের প্রতি আপনি বেশি দুর্বলতা অনুভব করেন, তাহলে তিনি কী উত্তর দেবেন?

---

৪৫. ইবনুল কাইয়্যিম, *হাদিউল আরওয়াহ,* পৃষ্ঠা : ৩৩

৪৬. হুমায়ুন আজাদ, *নারী,* পৃষ্ঠা : ৮৩

৪৭. *নারী,* পৃষ্ঠা : ৮৩-৮৪

অধিকাংশ পুরুষই যৌনতাকেন্দ্রিক চাহিদার কথা বলবেন। সৃষ্টিগতভাবেই নারীদের প্রতি পুরুষরা অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়। তাই অনেক সময় পুরুষদের চিন্তাভাবনা শারীরিক চাহিদাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। আর এই চাহিদাকে লাগাম না পরালেই ছড়িয়ে পড়ে অশ্লীলতা ও নানা অনাচার। নারীদের প্রতি পুরুষদের এই সহজাত দুর্বলতার প্রতি সতর্ক করেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> "আমার (ইন্তেকালের) পরে আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য নারী অপেক্ষা অধিক ফিতনার শঙ্কা আর কিছুতেই রেখে যাইনি।"[৪৮]

সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে আল্লাহ্ পুরুষদের পুরস্কার ঘোষণার সময় তাদের সহজাত যে আকর্ষণ, সেই নারীর কথা উল্লেখ করবেন। মুমিন পুরুষরা যদি দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার বাইরে না যায়, নারীর প্রতি আকর্ষণকে তার পাপের কারণ হতে না দেয়, তবে আল্লাহ ﷻ জান্নাতে তাদের জন্য রেখেছেন অতি উত্তম পবিত্র নারীদের।

যে প্রশ্নটার কথা বললাম সেটা যদি এবার কোনো নারীকে করা হয়, তো তিনি কী উত্তর দেবেন? এ ক্ষেত্রে উত্তরটা এত সহজ হবে না। কারণ, মেয়েদের চিন্তা কেবল একটি দিককে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাবে না, এমনকি একই নারীর মুডের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন সময় ও পরিবেশে বিভিন্ন উত্তর আসবে। কেউ বলবে সাজসজ্জা করে বাইরে যাওয়ার কথা, কেউ গান গাওয়ার, কেউ-বা হিন্দি সিরিয়াল দেখার কথা ইত্যাদি। খুব কমসংখ্যকই বলবে অবৈধ যৌনসম্পর্কের কথা। আসলে নারীদের বিভিন্ন দিকে দুর্বলতা থাকে। কেউ গৃহস্থালির কাজে, কেউ-বা সন্তান প্রতিপালন, কেউ কেউ দেহসজ্জার দিকে বেশি আকৃষ্ট থাকে। তাই পুরুষদের ক্ষেত্রে হুরদের কথা জানানো হয়েছে, আর নারীদের জন্যে বিষয়টা প্রশস্ত রাখা হয়েছে। জান্নাতী নারীরা যা কিছু নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চায়, তাদের তা-ই প্রদান করা হবে। তাদের ইচ্ছার ভিন্নতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই আল্লাহ কোনো নির্দিষ্ট পুরস্কারের উল্লেখ না করে বরং নারীদের সম্মানিত করেছেন।

■ নারীদের কর্মফল তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا

৪৮. বুখারি, *আস-সহীহ*, হাদীস নং : ৫০৯৬; মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং : ২৭৪০; তিরমিযি, *আস-সুনান*, হাদীস নং : ২৭৮০

يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

"যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোনো সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না।"[৪৯]

মহান আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٤٦﴾

"নিশ্চয় আল্লাহভীরুরা বাগান ও নির্ঝরিণীসমূহে থাকবে। বলা হবে, এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি-সহকারে প্রবেশ করো।"[৫০]

- জান্নাতীদের প্রতি আল্লাহ কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না

সবচেয়ে বড় কথা হলো, জান্নাতীদের প্রতি আল্লাহ ﷻ সব সময় সন্তুষ্ট থাকবেন। কখনো তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। আল্লাহ ﷻ বলেন :

قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

"আল্লাহ বললেন, আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা।"[৫১]

- জান্নাতীদের কখনো জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হবে না

সর্বোপরি জান্নাতীদের জান্নাত থেকে কখনো বহিষ্কার করা হবে না। আল্লাহ ﷻ বলেন :

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

"সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না।"[৫২]

---

৪৯. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১২৪

৫০. সূরা হিজর, ১৫ : ৪৪-৪৫

৫১. সূরা আল-মায়িদাহ, ৫ : ১১৯

৫২. সূরা আল-হিজর, ১৫ : ৪৭

রাসূল ﷺ বলেন,

> "যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে আনা হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যখানে দাঁড় করিয়ে যবেহ করে দেওয়া হবে। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ, এখানে আর তোমাদের মৃত্যু নেই। অনুরূপভাবে জাহান্নামীদেরও বলা হবে, হে জাহান্নামীরা, আর তোমাদের মৃত্যু নেই। এতে জান্নাতীদের খুশির সাথে আরও খুশি বর্ধিত হবে এবং জাহান্নামীদের শোকের সাথে আরও শোক সংযোজিত হবে।"[৫৩]

যেসব নারীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। সেখানে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। সম্মান জানানো হবে। সেখানে থাকবে না ইভটিজিং কিংবা ধর্ষণের মতো কোনো ন্যক্কারজনক ঘটনা। সেখানে সবাই প্রশান্তি-সহকারে বসবাস করবে। চিরস্থায়ী আনন্দ সবাইকে ঘিরে রাখবে। আর কোনোদিনই কাউকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হবে না।

❋ জান্নাতী নারীদের নিয়ামত সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল আলোচনা

শাইখ সুলাইমান ইবন সালেহ ؒ জান্নাতী নারীদের নিয়ামত সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করেছেন। যেখানে তিনি মিথ্যাবাদীদের মিথ্যাচারের জবাব দিয়েছেন। তিনি তাঁর আলোচনায় বলেন :

আল্লাহ যেখানেই জান্নাতের নিয়ামতরাজির আলোচনা করেছেন—যার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য পদের সুখাদ্য, অনির্বচনীয় সুন্দর দৃশ্যাবলি, সুরম্য সব আবাস এবং অনিন্দ্য বস্ত্রসামগ্রী—তার সবই নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণির জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত নিয়ামতসম্ভার জান্নাতে সবাই ভোগ করবে। বাকি থাকে কেবল এই প্রশ্ন, আল্লাহ তো পুরুষদের ডাগর চোখবিশিষ্ট হুর ও অপরূপা নারীদের কথা বলে জান্নাতের প্রতি আগ্রহী ও অনুপ্রাণিত করেছেন, অথচ নারীদের প্রলুব্ধকর এমন কিছু বলেননি। নারীরা সাধারণত এরই কারণ জানতে চান। এর জবাবে আমি বলি :

১. আল্লাহর এই বাণীটি আমাদের মাথায় রাখতে হবে :

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ۝٢٣

৫৩. মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : বেহেশত ও তার অধিবাসী..., ৮/৬৯৭৮

'তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরই প্রশ্ন করা হবে।'[৫৪]

তবে শারীআতের সুনির্দিষ্ট উদ্ধৃতি এবং ইসলামের মূলনীতির আলোকে এর হিকমত ও তাৎপর্য অনুধাবনের মানসিকতায় কোনো দোষ নেই।

২. এটা সুবিদিত যে নারীপ্রকৃতি বলতেই লজ্জার ভূষণে শোভিত। এ জন্যেই আল্লাহ তাদের সে নিয়ামতের বর্ণনা দিয়ে জান্নাতের প্রতি লালায়িত করেননি, যা তাদের লজ্জায় আরক্ত করে।

৩. এটাও সুবিদিত যে, নরের প্রতি নারীর আকর্ষণ ঠিক তেমন নয় যেমন নারীর প্রতি নরের আকর্ষণ। তাই দেখা যায়, আল্লাহ জান্নাতে নারীর কথা বলে পুরুষদের আগ্রহী করেছেন। পক্ষান্তরে পুরুষের প্রতি আকর্ষণের চেয়েও নারীদের আকর্ষণ বেশি অলংকার ও পোশাকের সৌন্দর্যের প্রতি। কারণ, এটি তাদের সহজাত প্রকৃতি। যেমন, আল্লাহ ﷻ বলেন :

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾

"আর যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্ককালে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদানে অক্ষম।"[৫৫]

৪. শাইখ উসাইমিন رحمه الله বলেন, 'আল্লাহ ﷻ স্ত্রীদের কথা উল্লেখ করেছেন স্বামীদের জন্যে। কারণ, স্বামীই হলো স্ত্রীর কামনাকারী এবং তার প্রতি মোহিত। এ জন্যেই জান্নাতে পুরুষদের জন্যে স্ত্রীদের কথা বলা হয়েছে, আর নারীদের জন্যে স্বামীদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু এর দাবি কিন্তু এই নয় যে, তাদের স্বামী থাকবে না; বরং তাদের জন্যেও আদমসন্তানদের মধ্য থেকে স্বামী থাকবে।'

দুনিয়ায় নারীদের অবস্থা নিম্নোক্ত প্রকারগুলোর বাইরে নয় :

ক. হয়তো সে বিয়ের আগেই মারা যাবে।

খ. কিংবা সে মারা যাবে তালাকের পর অন্য কারও সাথে বিয়ের আগে।

গ. কিংবা সে বিবাহিতা কিন্তু—আল্লাহ রক্ষা করুন—তার স্বামী তার সঙ্গে জান্নাতে যাবে না।

---

৫৪. সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ২৩

৫৫. সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩ : ১৮

ঘ. কিংবা সে তার বিয়ের পরে মারা যায়।

ঙ. কিংবা তার স্বামী মারা গেল, আর সে আমৃত্যু বিয়ে ছাড়াই রইল।

চ. কিংবা তার স্বামী মারা গেল, তারপর সে অন্য কাউকে বিয়ে করল।

দুনিয়াতে নারীদের এ কয়টি ধরনই হতে পারে। আর এসবের প্রত্যেকটির জন্যেই জান্নাতে স্বতন্ত্র অবস্থা রয়েছে :

১. যে নারী বিয়ের আগে মারা গেছেন, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দুনিয়ার কোনো পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। কারণ, আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

> "কিয়ামতের দিন যে দলটি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। আর তৎপরবর্তী দলের চেহারা হবে আসমানে মুক্তার ন্যায় ঝলমলে নক্ষত্রসদৃশ উজ্জ্বল। তাদের প্রত্যেকের থাকবে দুজন করে স্ত্রী, যাদের গোশতের ওপর দিয়েই তাদের পায়ের গোছার ভেতরস্থ মজ্জা দেখা যাবে। আর জান্নাতে কেউ অবিবাহিত থাকবে না।"[৫৬]

শাইখ উসাইমিন ﵀ বলেন, 'যদি ইহকালে মহিলার বিয়ে না হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ ﷻ তাকে জান্নাতে এমন একজনের সঙ্গে বিয়ে দেবেন, যা দেখে তার চোখ জুড়িয়ে যাবে। কারণ, জান্নাতের নিয়ামত ও সুখসম্ভার শুধু পুরুষদের জন্যে নয়; বরং তা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যে বরাদ্দ। আর জান্নাতের নিয়ামতসমূহের একটি এই বিয়ে।'

২. তালাক প্রাপ্ত হয়ে আর বিয়ে না করে মারা যাওয়া মহিলার অবস্থাও হবে অনুরূপ।

৩. একই অবস্থা ওই নারীর, যার স্বামী জান্নাতে প্রবেশ করেননি। শায়খ উসাইমিন ﵀ বলেন, 'মহিলা যদি জান্নাতবাসী হন, আর তিনি বিয়ে না করেন কিংবা তাঁর স্বামী জান্নাতী না হন, সে ক্ষেত্রে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করলে সেখানে অনেক পুরুষ দেখতে পাবেন যারা বিয়ে করেননি।' অর্থাৎ তাদের কেউ তাকে বিয়ে করবেন।

৪. আর যে নারী বিয়ের পর মারা গেছেন, জান্নাতে তিনি সেই স্বামীরই হবেন, যার কাছ থেকে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন।

৫. যে নারীর স্বামী মারা যাবে আর তিনি পরবর্তীকালে আমৃত্যু বিয়ে না করবেন, জান্নাতে তিনি এ স্বামীর সঙ্গেই থাকবেন।

---

৫৬. মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং : ৭৩২৫

৬. যে মহিলার স্বামী মারা যায় আর তিনি তার পরে অন্য কাউকে বিয়ে করেন, তাহলে তিনি যত বিয়েই করুন না কেন, জান্নাতে তিনি সর্বশেষ স্বামীর সঙ্গী হবেন। কারণ, আবু দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মহিলা তার সর্বশেষ স্বামীর সাথেই থাকবে।"[৫৭]

হুযায়ফা ﷺ তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে বলেন :

> 'যদি তোমাকে এ বিষয় খুশি করে যে, তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী হিসেবে থাকবে, তবে আমার পর আর বিয়ে কোরো না। কেননা, জান্নাতে নারী তার সর্বশেষ দুনিয়ার স্বামীর সঙ্গে থাকবেন। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর, তাঁর স্ত্রীদের জন্যে অন্য কারও সঙ্গে বিবাহবন্ধনে জড়ানো হারাম করা হয়েছে। কেননা, তাঁরা জান্নাতে তাঁরই স্ত্রী হিসেবে থাকবেন।'[৫৮]

মাসআলা : কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন, জানাযার দুআয় এসেছে আমরা যেমনটি বলে থাকি :

وأبدلها زوجا خيرا من زوجها

'আর তার স্বামীর পরিবর্তে তাকে আরও উত্তম স্বামী দান করুন।'

এর আলোকে তিনি যদি বিবাহিতা হন, তাহলে আমরা কীভাবে তার জন্যে এ দুআ করি? কারণ, আমরা জানি দুনিয়াতে তার স্বামী যিনি হবেন জান্নাতে তিনিই তার স্বামী থাকবেন; আর যদি তার বিয়ে না হয়, তবে তার স্বামী কোথায়? শাইখ উসাইমিন ﷺ-এর ভাষায় এর জবাব, 'যদি মহিলা বিবাহিতা না হন, তবে দুআর উদ্দেশ্য হবে তার জন্যে বরাদ্দ পুরুষ। আর যদি বিবাহিতা হন, তবে তার জন্যে আরও উত্তম স্বামীর উদ্দেশ্য হবে। দুনিয়ার স্বামীর চেয়ে গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যে উত্তম স্বামী। কারণ, বদল দুই ধরনের। এক হলো সত্তার বদল। যেমন : কেউ ছাগলের বিনিময়ে উট কিনল। দুই হলো গুণের বদল। যেমন : আপনি বললেন, আল্লাহ এ ব্যক্তির কুফরকে ঈমানে বদলে দিয়েছেন। এখানে কিন্তু ব্যক্তি একজনই। পরিবর্তন কেবল তার বৈশিষ্ট্যে। আল্লাহ তাআলার বাণীতেও আমরা দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। ইরশাদ হচ্ছে :

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

---

৫৭. আলবানি, *সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সাহীহা* : ৩/২৭৫; জামে সাগীর, হাদীস নং : ৬৬৯১
৫৮. বাইহাকি, *আস-সুনান আল-কুবরা*, হাদীস নং : ১৩৮০৩

"যেদিন এ জমিন ভিন্ন জমিনে রূপান্তরিত হবে এবং আসমানসমূহও। আর তারা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে হাযির হবে।"[৫৯]

আয়াতে উল্লেখিত জমিন বা ভূমি কিন্তু একই থাকবে। তবে তা কেবল প্রলম্বিত হয়ে যাবে। তেমনি আসমানও থাকবে সেটিই, কিন্তু তা বিদীর্ণ হয়ে যাবে। অন্যদিকে আরেক সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে—জান্নাতে দুনিয়াবাসীর স্ত্রী হবে তার দুনিয়ার স্ত্রী থেকে দুজন। যেমন : ইমাম মুসলিম ﷺ বলেন,

'আমার কাছে আমর নাকেদ ও ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম দাওরাকি ইবন উলাইয়া থেকে বর্ণনা করেন, আর শব্দগুলো ইয়াকূবের। উভয়ে বলেন, আমাদের কাছে ইসমাঈল ইবন উলাইয়া বর্ণনা করেন, আমাদের আইয়ূব মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জান্নাতে পুরুষ না নারীর সংখ্যা বেশি হবে তা নিয়ে তারা পরস্পর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, আবুল কাসেম (রাসূলুল্লাহ) ﷺ কি বলেননি, 'কিয়ামতের দিন যে দলটি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল; আর তৎপরবর্তী দলের চেহারা হবে আসমানে মুক্তার ন্যায় ঝলমলে নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল। তাদের প্রত্যেকের থাকবে দুজন করে স্ত্রী, যাদের গোশতের ওপর দিয়েই তাদের পায়ের গোছার ভেতরস্থ মজ্জা দেখা যাবে। আর জান্নাতে কোনো অবিবাহিত থাকবে না।'[৬০]

"হে নারী সম্প্রদায়, তোমরা বেশি বেশি সদকা করো। কেননা, আমি তোমাদের বেশি জাহান্নামের অধিবাসী দেখেছি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ বাণীর ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন, 'হতে পারে জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা বেশি হবার বিষয়টি তারা জান্নাতে প্রবেশের আগের কথা। লা ইলাহা ইল্লাল্লা বলনেওয়ালা সবাই সুপারিশলাভ ও আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির পর জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলে জান্নাতে নারীর সংখ্যাই হবে বেশি।' সারকথা, নারীদের প্রত্যাশা ও আত্মবিশ্বাস রাখা উচিত যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবেন না।"[৬১]

❋ জান্নাতী নারীদের সব চাহিদাই পূর্ণ হবে

শাইখ সুলাইমান ﷺ-এর আলোচনা আমাদের সামনে এই কথা পরিষ্কার করে

৫৯. সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪৮
৬০. মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং : ৭৩২৫
৬১. খারাশি, সুলাইমান ইবন সালেহ, *জান্নাতে নারীদের অবস্থা*, পৃষ্ঠা : ৭-১৩

দেয় যে, যে সমস্ত পুণ্যবতী নারীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, মহান আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের সকল চাহিদাই পূর্ণ করবেন। কোনো চাহিদাই অপূর্ণ থাকবে না। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে আমরা দেখেছি, জান্নাতীদের কেউই অবিবাহিত থাকবে না। নেককার পুরুষেরা যেমন স্ত্রীদের নিয়ে জান্নাতের স্বপ্নীল ভুবনে বিচরণ করবে, ঠিক তেমনি জান্নাতী নারীরাও তাদের পুণ্যবান স্বামীদের নিয়ে তাদের জান্নাতে বিচরণ করবে। শুধু বিয়েই নয়, বরং জান্নাতে তাদের যুবতীও বানিয়ে দেওয়া হবে। আর জান্নাতীদের যৌবন কোনোদিন শেষ হবে না। আয়িশা ﵂ বলেন,

> "একবার এক আনসারি বৃদ্ধা নবি ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কাছে দুআ করেন—তিনি যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।' নবি ﷺ বললেন, 'জান্নাতে তো কোনো বৃদ্ধ মানুষ প্রবেশ করবে না।' এ কথা শুনে বৃদ্ধা বড় কষ্ট পেলেন। তখন নবি বললেন, 'আল্লাহ যখন তাদের (বৃদ্ধদের) জান্নাতে দাখিল করাবেন, তিনি তাদের কুমারীতে রূপান্তরিত করে দেবেন।'"[৬২]

আল্লাহর বাণী ও মহানবি ﷺ-এর হাদীস আমাদের এটা অনুধাবন করতে সহায়তা করে যে, পুণ্যবতী নারীরা দুনিয়ায় যেমন সম্মানিত, আখিরাতেও তেমনি তারা সম্মানিত। জান্নাতে তারা অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত হবে। তাদের এমন যৌবন দান করা হবে, যা কোনোদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে না। চেহারায় কোনোদিন বার্ধক্যের ছাপ আসবে না। সৌন্দর্য কখনো ম্লান হবে না। আর তারা জান্নাত থেকে কখনো বহিষ্কৃত হবে না।

ইসলাম নারীকে পুরুষের ভোগ্যসামগ্রী বানিয়েছে, চুক্তিবদ্ধ দাসী বানিয়েছে, যারা এই সব কথা বলে নিজেদের সময়কে নষ্ট করছেন, তাদের আমরা বলব—আপনারা ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করুন। নিজেদের জানার পরিধিকে আরও বিস্তৃত করুন। জেনে রাখুন, আপনাদের বৃথা আস্ফালন মুমিনদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।

---

৬২. তিরমিযি, *আশ-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ*, হাদীস নং : ২৩৮; আলবানি, *সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ*, হাদীস নং : ২৯৮৭

০৩

ঋতুকালীন অবস্থা ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ

ঋতুমতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ইসলামের মনোভাব কী, সেটি না জেনেই হুমায়ুন আজাদ ব্যাপারটি নিয়ে সমালোচনা করেছেন কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী। তিনি বলেছেন,

> *"ঋতুক্ষরণকে প্রতিটি ধর্ম ও আদিম সমাজ দেখেছে দানবিক ব্যাপার রূপে। পিতৃতন্ত্রের সূচনা থেকেই নারীর স্রাবকে অশুভ ধারারূপে দেখা হচ্ছে, এবং একে এতো বিধিনিষেধে ঘিরে দেয়া হয়েছে যে আজো পুরুষেরা এর নামে শিউরে ওঠে।"... "বাইবেল ও কোরআনে ও সব ধর্ম পুস্তকে ঋতুকে দেখা হয়েছে ভয়ের চোখে, এবং ঋতুমতী নারীদের নির্দেশ করা হয়েছে নিষিদ্ধ ও দূষিত প্রাণীরূপে।"*[৬৩]

> *"পৃথিবীর চারটি প্রধান ধর্ম— হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্ট, ইসলাম ধর্মের চোখে নারীর মাসিক চক্র অত্যন্ত অপবিত্র।"... "প্রতিটি ধর্মে ঋতুমতী নারী পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।"*[৬৪]

আসলে ধারণার বশবর্তী হয়ে সমালোচক হওয়া যায় না। সমালোচক হতে হলে সে বিষয়ের বিশদ জ্ঞান থাকতে হয়। হুমায়ুন আজাদ নিজেও বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি তার বইয়ের ভূমিকায় ওই সব আলিমদের সমালোচনা করেছেন, যারা ধারণার বশবর্তী হয়ে (তার ভাষায়) নারী বইটি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

> *"ইসলামি ফাউন্ডেশনের দুটি বিশেষজ্ঞ— একটি দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের আরেকটি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির পরিচালক;— তারা এ-বিশাল*

---

৬৩. হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, পৃষ্ঠা : ৪৪

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২১৭

বইটি থেকে ১৪ টি বাক্য উদ্ধৃত ক'রে পরামর্শ দিয়েছে : 'উপরোক্ত উদ্ধৃতি ও মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বইটি বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করা যায়।' এতো বড়ো বইটি পড়ার শক্তি ওই দুই মৌলবাদীর ছিল না; তারা বইটি থেকে কয়েকটি বাক্য তুলে পরামর্শ দেয় নিষিদ্ধ করার।"[৬৫]

তার কথার সূত্র ধরেই বলতে চাই, আজাদেরও উচিত ছিল—ঋতুমতী নারীদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী, আগে সেটি নিয়ে পড়াশোনা করা। তারপর এই বিষয়ে কথা বলা। তা না করে সব ধর্মের সাথে ইসলামকে গুলিয়ে ফেলার কোনো মানে হয় না। হ্যাঁ, কোনো কোনো ধর্ম ঋতুমতী নারীদের অবজ্ঞার চোখে দেখেছে, এ কথা সত্য। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম দেখেছে, তাই ইসলামও দেখবে—এমন ধারণা নিতান্তই বাতুলতা। আর এমন ধারণা থেকে সমালোচনা করাটা জ্ঞানবান লোকের কাজ নয়। ইসলাম নিয়ে তার মিথ্যাচার দেখে কুরআনের একটি আয়াতের কথা মনে পড়ে গেল। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝٨ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝٩

"মানুষের মধ্য কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাদের কাছে না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ, না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব। সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে—লোকদের আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করার জন্যে। তার জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে আস্বাদন করাব দহনযন্ত্রণা।"[৬৬]

❋ ঋতুস্রাব (Menstruation) কাকে বলে?

ড. আজাদের অভিযোগটি নিয়ে আলোচনার পূর্বে ঋতুস্রাব (Menstruation) কাকে বলে, সেটি জেনে নেওয়া যাক। প্রথমত আমরা ঋতুস্রাবের ইসলামি সংজ্ঞা দেখব, এরপর চিকিৎসাবিজ্ঞানের। শাইখ উসাইমিন ؒ বলেন,

"ঋতুস্রাবের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো বস্তু নির্গত ও প্রবাহিত হওয়া। আর শারীআতের পরিভাষায় ঋতুস্রাব বলা হয় ওই প্রাকৃতিক রক্তকে, যা বাহ্যিক

---

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১০

৬৬. সূরা আল-হাজ্জ, ২২ : ৮-৯

কোনো কার্যকারণ ব্যতীতই নির্দিষ্ট সময়ে নারীর যৌনাঙ্গ দিয়ে নির্গত হয়। ঋতুস্রাব প্রাকৃতিক রক্ত, অসুস্থতা আঘাত পাওয়া, পড়ে যাওয়া এবং প্রসবের সাথে এর কোনো সম্পর্কে নেই। এই প্রাকৃতিক রক্ত নারীর অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির বিভিন্নতার কারণে নানা রকম হয়ে থাকে। এবং এই কারণেই ঋতুস্রাবের দিক থেকে নারীদের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়।"[৬৭]

মেডিকেল সাইন্স অনুসারে ঋতুস্রাব হলো—"উচ্চতর প্রাইমেট (Primate) বর্গের স্তন্যপায়ী (Mammalian) স্ত্রীদের একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, যা প্রজননের সাথে সম্পর্কিত। প্রতিমাসে এটি হয় বলে বাংলায় এটিকে মাসিক নামেও অভিহিত করা হয়। প্রজননের উদ্দেশ্যে নারীদের ডিম্বাশয়ে (Ovum) ডিম্বস্ফোটন হয় এবং তা ফ্যালোপিয়ান টিউব (Fallopeian Tube) দিয়ে নারীদের জরায়ুতে চলে আসে। এই পরিস্ফুটিত ডিম্ব জরায়ুতে ৩-৪ দিন অবস্থান করে। এই সময়ের মধ্যে যদি কোনো শুক্রাণু নারীদেহের জরায়ুতে প্রবেশ না করে, তাহলে সেই ডিম্বাণু নষ্ট হয়ে যায়। সেই সাথে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম (Endometrium) স্তর ভেঙে পড়ে।

আর যদি পুরুষের শুক্রাণু (Sperm) সেখানে পৌঁছায়, তাহলে তা নিষিক্ত হয়ে যায় এবং ভ্রূণের (Zygote) সূচনা ঘটে। এন্ডোমেট্রিয়াম এর ভঙ্গ ঝিল্লি, সঙ্গের শ্লেষ্মা ও এর রক্তবাহ থেকে উৎপন্ন রক্তপাত সব মিশে তৈরি তরল এবং তার সাথে তঞ্চিত এবং অর্ধ-তঞ্চিত তরল কদিন ধরে লাগাতার যোনিপথে নির্গত হয়। এই ক্ষরণই ঋতুস্রাব নামে পরিচিত। কখনো কখনো একে গর্ভস্রাব হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। যদি জরায়ুতে অবমুক্ত ডিম্বটি পুরুষের শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়ে Implantation শুরু হয়, তবে আর ঋতুস্রাব হয় না। তাই ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়াকে মেয়েদের গর্ভধারণের প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। ঋতুস্রাব যুবতীদের ক্ষেত্রে সাধারণত ২১-৪৫ দিন পর পর ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে ২১-৩১ দিন পর পর হয়ে থাকে। সাধারণত মেয়েদের যখন ১১ বা ১৩, তখন থেকেই ঋতুস্রাব শুরু হয়। যখন ঋতুস্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, যখন সেটিকে Menopause শুরু হয়।[৬৮]

❋ আজাদের ব্যবহৃত আয়াত

এই হলো ঋতুর অতি সংক্ষেপ বিবরণ। ড. আজাদ তার বইতে ঋতুস্রাব-বিষয়ক

---

৬৭. উসাইমিন, মুহাম্মাদ বিন সালেহ, *الدماء الطبيعية للنساء (নারীর প্রাকৃতিক রক্তস্রাব)*, পৃষ্ঠা : ৪

৬৮. "Menstruation and the menstrual cycle fact sheet". Office of Women's Health. December 23, 2014. Retrieved 25 June 2015.

আলোচনা করতে গিয়ে কুরআনের একটি আয়াত ব্যবহার করেছেন। এ আয়াত থেকেই তিনি বুঝে গেছেন, ঋতুমতী নারীদের প্রতি ইসলামের বিধান অত্যন্ত অমানবিক! তার উল্লেখিত আয়াতটি হলো,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"আর তারা তোমাকে ঋতু সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বলো তা কষ্টকর। সুতরাং তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হোয়ো না। অতঃপর তারা যখন পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদের পছন্দ করেন।"[৬৯]

❋ আয়াতটির শানে নুযুল

আয়াতটি মূলত ইহুদিদের লক্ষ্য করে নাযিল হয়। ইহুদিরা ঋতুমতী নারীদের সাথে খারাপ আচরণ করত। তাদের ঘোড়ার আস্তাবলে রেখে দিত। ভালোমতো খাবার গ্রহণ করতে দিত না। এমনকি দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত বন্ধ রাখত। এভাবে ঋতু চলাকালীন মেয়েলোকেরা অবহেলিত হতো ইহুদিসমাজে। মক্কার পৌত্তলিকরাও ঋতুমতী মহিলাদের অবজ্ঞা করত। কিন্তু এরা আবার এই সময়ে যৌনমিলনও তারা। সাহাবারা তাদের স্ত্রীদের সাথে এই সময়ে কী ধরনের ব্যবহার করবেন, তা রাসূল ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আনাস رضي الله عنه বলেন,

"ইহুদিরা তাদের মহিলাদের ঋতুস্রাব হলে তার সঙ্গে একসাথে আহার করত না এবং এক ঘরে বাস করত না। সাহাবিগণ এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ ﷻ এ আয়াত নাযিল করলেন : "তারা তোমার কাছে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও যে, তা হলো কষ্টদায়ক...।" এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ করো।' এ খবর ইহুদিদের কাছে পৌঁছলে তারা বলল, 'এ লোকটি সব কাজেই কেবল আমাদের বিরোধিতা করতে চায়।' অতঃপর উসায়দ ইবন হুযায়র ও আব্বাদ ইবন বিশর এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, ইহুদিরা

৬৯. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২২২

তো এ রকম এ রকম বলছে। আমরা কি তাদের সাথে (ঋতুকালীন অবস্থায়) সহবাস করব না?' (এ কথা শুনে) রাসূল ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের ওপর ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন। তারা (উভয়ে) বেরিয়ে গেল। ইতোমধ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দুধ হাদিয়া এল। তিনি তাদের ডেকে আনার জন্যে লোক পাঠালেন। (তারা এলে) তিনি তাদের দুধ পান করালেন। তখন তারা বুঝল যে, তিনি ﷺ তাদের ওপর রাগ করেননি।"[৭০]

❋ আয়াতটি সত্যিকার অর্থে কী বুঝিয়েছে?

আয়াটিতে আল্লাহ ﷻ ঋতুস্রাবের সময়ের কথা বর্ণনা করেছেন। ঋতুস্রাবের সময় যে তাদের জন্যে কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক তা উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি এই সময়ে তাদের সাথে যৌনমিলন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "সুতরাং তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হোয়ো না।"

অনেকেই এই অংশটুকুর অপব্যবহার করেন। তারা বলতে চান, 'এই আয়াতাংশটুকু ঋতুকালীন নারীদের সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে। অর্থাৎ এ সময়ে নারীদের সাথে কথাবার্তা, একই বিছানায় শোয়া কিংবা প্রাত্যহিক কাজে তাদের সহায়তা নেওয়াকেও নিষিদ্ধ করেছে।' অথচ আমরা যখন আয়াতটির তাফসীরের দিকে নজর দিই তখন দেখতে পাই যে, আয়াতটি তাদের মতামতের বিপরীত অর্থ নির্দেশ করেছে। কেননা, এই অংশটুকুর মাধ্যমে ঋতুস্রাবের সময় যৌনমিলন থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে[৭১], ঋতুমতী নারী থেকে নয়।

❋ হাদীস থেকে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনা

আর আমরা পূর্বের হাদীসে দেখেছি, নবি ﷺ বলেছেন, "তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ করো।" সুতরাং এ সময়ে নারীদের থেকে

---

৭০. মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৬০১; ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : বিবাহ, হাদীস নং : ১৯২৫; ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম* : ১/৬০৯; ইবনু হাজার আসকালানি, *বুলুগুল মারাম*, অধ্যায় : ঋতুবতী মহিলাদের যে সকল কাজ বৈধ, হাদীস নং : ১৪৩

৭১. ইমাম ইবনু কাসীর বলেন, "আর ঋতুস্রাবের সময় স্ত্রীর সাথে মিলন হারাম হওয়ার ওপর সব আলিমই একমত। কেননা, এটা জঘন্যতম অপরাধ এবং যে ব্যক্তি তা করবে, সে অবশ্যই পাপে লিপ্ত হবে।" [ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম* : ২/২১৫]

দূরে থাকা বলতে তাদের পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়নি; বরং কেবল তাদের সাথে যৌনমিলন করতে বারণ করা হয়েছে। নবি ﷺ-এর হাদীস থেকে আমরা এ বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ।

▪ ঋতুমতী নারীদের সাথে এক বিছানায় শোয়া

রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঋতুস্রাবের সময়ে একই বিছানায় শয়ন করতেন। এতে কোনো সংকোচবোধ করতেন না। তাঁদের অপয়া মনে করতেন না। এমনও দেখা গেছে, তিনি ﷺ একই চাদরের ভেতরে ঋতুমতী স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ঘুমিয়েছেন। রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা رضي الله عنها বলেন,

> "আমি নবি ﷺ-এর সাথে একই চাদরের নিচে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার ঋতুস্রাব দেখা দিলে আমি চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে হায়েজের কাপড় পড়ে নিলাম। তিনি বললেন, 'তোমার কি স্রাব দেখা দিয়েছে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তার সঙ্গে চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম।"[৭২]

নবি ﷺ-এর স্ত্রী মায়মুনা رضي الله عنها বলেছেন,

> "আমি ঋতুমতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাতেন। এ সময় আমার ও তাঁর মাঝে কেবল একখানা কাপড় আড়াল থাকত।"[৭৩]

▪ সাধারণ মেলামেশা

এই সময়টাতে যৌনমিলন ছাড়া তাদের সাথে সব ধরনের মেলামেশা করা যায়। তাদের সাথে খাবার খাওয়া, চলাফেরা করা, গোসল করা প্রভৃতি। হাদীস পড়লে দেখা যায়, রাসূল ﷺ এই সময়ে তাঁর স্ত্রীদের দ্বারা মাথা আঁচড়াতেন, একই পাত্রে গোসল করতেন, পাশাপাশি বসে গল্প করতেন। আয়িশা رضي الله عنها বলেন,

> "আমি ও নবি ﷺ জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি ইযার পরে নিতাম। আর আমার ঋতুস্রাব অবস্থায় তিনি আমার সাথে মিশামিশি করে ঘুমাতেন।"[৭৪]

---

৭২. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ, ১/২৯৪; মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৫৮১; আহমাদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* অধ্যায় : হায়েজ-ইস্তিহাযা ও নিফাস, ১/৩২৬; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* ১/৬৩৭

৭৩. মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৫৮৯, ৫৯০; আলবানি, *সহীহ আত-তিরমিযি,* ১/১৩২; আহমাদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* অধ্যায় : হায়েজ-ইস্তিহাযা ও নিফাস, ১/৩২৪,

৭৪. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ, ১/২৯৫

রাসূল ﷺ এই সময়ে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে একই থালায় খাবার খেতেন। রাসূল ﷺ ওই দিকে ঠোঁট লাগিয়ে পানি খেতেন, যেদিক দিয়ে মা আয়িশা رضي الله عنها ঋতুমতী অবস্থায় পানি খেতেন। রাসূল ﷺ হাড়কে ওই দিক থেকেই চিবাতেন, যেদিক থেকে আয়িশা رضي الله عنها চিবাতেন। আয়িশা رضي الله عنها বলেছেন,

> "আমি ঋতুমতী অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পরে নবি ﷺ-কে অবশিষ্টটুকু প্রদান করলে, আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম তিনিও সেই স্থানেই মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আবার আমি ঋতুমতী অবস্থায় হাড় খেয়ে তা নবি ﷺ-কে দিলে, আমি যেখানে মুখ লাগিয়েছিলাম তিনি সেখানে মুখ লাগিয়ে খেতেন।"[৭৫]

রাসূল ﷺ শুধু নিজেই ঋতুমতী স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণ করতেন, তা নয়। তিনি সাহাবাদেরও ভালো আচরণের নির্দেশ দিতেন। রাসূল ﷺ-এর সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ رضي الله عنه বলেন,

> "আমি ঋতুমতী নারীর সাথে একত্রে পানাহার সম্পর্কে নবি ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, 'তার সাথে খাও।'"[৭৬]

■ স্ত্রীকে আলিঙ্গন করা

আয়িশা رضي الله عنها বলেন,

> "আমাদের কেউ ঋতুস্রাবগ্রস্ত হলে নবি ﷺ তাঁকে তাঁর (লজ্জাস্থানে) পাজামা শক্তভাবে বাঁধার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তাঁকে আলিঙ্গন করতেন।"[৭৭]

আয়িশা رضي الله عنها আরেকটি হাদীসে বলেন,

> "আমাদের কেউ যখন ঋতুমতী হয়ে পড়ত, তখন তাঁর পূর্ণ হায়েজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পরিধেয় বস্ত্র বেঁধে নেয়ার হুকুম দিতেন। তারপর তাঁর সাথে মেলামেশা করতেন। তোমাদের মধ্যে কে তার কামভাব সেরূপ আয়ত্তে রাখতে সক্ষম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেরূপ তাঁর কামভাব আয়ত্তে রাখতে সক্ষম ছিলেন?"[৭৮]

---

৭৫. মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৫৯৯; আহমাদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* অধ্যায় : হায়েজ-ইস্তিহাযা ও নিফাস, ১/৩২৭; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* ১/৬৩৪; আবু দাউদ, *আস-সুনান,* ১/২৫৯

৭৬. আলবানি, *সহীহ আত-তিরমিযি,* ১/১৩৩; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, ১/৬৫১; নাসাঈ, *আস-সুনান,* ১/৭৬৮

৭৭. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ, ১/২৯৬; মালিক বিন আনাস, *আল-মুয়াত্তা,* অধ্যায় : পবিত্রতা অর্জন, ১/৯৪; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ, ১/৬৩৫, ৬৩৬

৭৮. মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৫৮৬; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* ১/৬৩৫

▪ ইবাদাত করা

রাসূল ﷺ এই সময়ে তাঁর স্ত্রীদের কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, কিন্তু এতে কোনো সমস্যা বোধ করতেন না। নাক সিটকাতেন না। আয়িশা ؓ বলেন,

> "নবি ﷺ আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি হায়েজের অবস্থায় ছিলাম।"[৭৯]

রাসূল ﷺ ঋতুমতী স্ত্রীকে পাশে রেখে কিয়ামুল লাইল আদায় করতেন। তাঁর স্ত্রী সিজদার জায়গায় সোজাসুজি শুয়ে থাকতেন, আর তিনি চাটাইয়ের ওপর সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন, তখন তাঁর কাপড়ের কিছু অংশ স্ত্রীর গায়ে লাগত। ইবন শাদ্দাত ؓ বলেন,

> "আমি আমার খালা নবি ﷺ-এর পত্নী মায়মূনা ؓ থেকে শুনেছি—তিনি ঋতুমতী অবস্থায় সালাত আদায় করতেন না। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিজদার জায়গায় সোজাসুজি শুয়ে থাকতেন। নবি ﷺ তাঁর চাটাইয়ে ওপর সালাত আদায় করতেন। সিজদা করার সময় নবি ﷺ-এর কাপড়ের অংশ খালার গায়ে লাগত।"[৮০]

▪ প্রাত্যহিক যেকোনো কাজে ঋতুমতী স্ত্রীর সাহায্য নেওয়া

আয়িশা ؓ বলেছেন,

> "রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফ থাকা অবস্থায় মসজিদ থেকে আমাকে (হাত বাড়িয়ে) জায়নামাযটি দেয়ার জন্যে আদেশ করলেন। আমি বললাম, আমি তো ঋতুমতী। তিনি আবার বললেন, তা আমাকে দাও। ঋতু তো আর হাতে লেগে নেই।"[৮১]

উরওয়া ؒ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ঋতুমতী স্ত্রী কি স্বামীর খেদমত করতে পারবে? অথবা গোসল ফরয হওয়ার অবস্থায় কি স্বামীর নিকটবর্তী হতে পারে? উরওয়া ؒ জবাব দিলেন,

---

৭৯. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ, ১/২৯৩; মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৬০০; আহমাদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* অধ্যায় : হায়েজ-ইস্তিহাযা ও নিফাস, ১/৩২৭-৩২৮; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* ১/৬৩৪; আবু দাউদ, *আস-সুনান,* ১/২৬০; নাসাঈ, *আস-সুনান,* ১/২৭৪

৮০. মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৫৯৭, ৫৯৮; আহমাদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* অধ্যায় : হায়েজ-ইস্তিহাযা ও নিফাস, ১/৩২৯

৮১. মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৫৯৭, ৫৯৮; আহমাদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* অধ্যায় : হায়েজ-ইস্তিহাযা ও নিফাস, ১/৩২৮; আলবানি, *সহীহ আত-তিরমিযি,* ১/১৩৪; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* ১/৬৩২

"এ সবই আমার কাছে সহজ। এ ধরনের সকল মহিলাই স্বামীর খেদমত করতে পারে। এ ব্যাপারে কারও অসুবিধা থাকার কথা নয়। আমাকে আয়িশা ﷺ বলেছেন, তিনি ঋতুমতী অবস্থায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চুল আঁচড়ে দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে তার হুজরার দিকে মাথাটা বাড়িয়ে দিতেন। তখন তিনি মাথার চুল আঁচড়াতেন, অথচ তিনি ছিলেন ঋতুমতী।"[৮২]

ইসলাম কোথায় ঋতুমতী নারীদের অবজ্ঞা করল? কোথায় ঋতুমতী অবস্থাকে দানবিক মনে করল? কোথায় তাদের পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করল? আসলে ড. আজাদ কিছু ভুল ধারণা ও মিথ্যা বক্তব্যের সাহায্যে ইসলামকে আক্রমণ করেছেন। তার কারণ হলো ইসলাম সম্পর্কে তার যথাযথ জ্ঞানের অভাব। একবার নিরপেক্ষ মন নিয়ে ভাবুন, সেই সাথে ওপরের দলিলগুলো সামনে রাখুন।[৮৩] তারপর আপনিই বলুন, ইসলাম ঋতুমতী নারীকে কতটা সম্মানের আসনে বসিয়েছে। এই সময়ে নারীদের সালাতের মতো ফরয ইবাদাতকেও মাফ করে দিয়েছে।[৮৪] তাদের পাশে এনে তাদের স্বামী, তাদের পরিবারকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাদের সাথে এক বিছানায় ঘুমাতে, তাদের একসাথে নিয়ে খাবার খেতে, ইবাদাতের সময় পাশে রাখতে আদেশ দিয়েছে। যাতে করে ঋতুমতী নারীর বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পতিত না হয়। সে যাতে অন্যান্য সময়ের মতোই সাধারণ জীবনযাপন করতে পারে।

❋ ইসলাম ক্ষেত্র-বিশেষে পুরুষদেরও অপবিত্র ঘোষণা করেছে

এরপরও যদি কেউ বলে যে, ইসলাম তাদের অপয়া-অশুচি না বললে কী হবে; তাদের তো এই সময়ে অপবিত্র বলেছে। আচ্ছা, ইসলাম কি শুধু পিরিয়ড চলাকালীন নারীদের অপবিত্র ঘোষণা করেছে? নাকি ক্ষেত্র-বিশেষে পুরুষদেরও অপবিত্র ঘোষণা করেছে? ইসলাম যেমন ঋতুকালীন নারীদের অপবিত্র বলেছে, ঠিক তেমনি বীর্যপাতের পর পুরুষদেরও অপবিত্র বলেছে। রাসূল ﷺ বলেন,

---

৮২. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ, ১/২৯২

৮৩. শুধু কুরআন ও নবি ﷺ-এর সহীহ হাদীস থেকে, এ ধরনের আরও অগণিত দলিল হাজির করা যাবে। বইয়ের কলেবর বেড়ে যাবে তাই খুব অল্পই দলিল দেওয়া হলো। আগ্রহী পাঠকগণ হাদীসের কিতাবগুলোর "হায়েজ (Menstruation)" অধ্যায়টি পড়তে পারেন। তাহলে ইন শা আল্লাহ এই ধরনের আরও অসংখ্য দলিল দেখতে পাবেন।

৮৪. এক মহিলা আয়িশা ﷺ-কে বললেন, 'আমাদের জন্য হায়েজকালীন কাযা সালাত পবিত্র হওয়ার পর আদায় করলে চলবে কি না?' আয়িশা ﷺ বললেন, 'তুমি কি হারুরিইয়্যা? আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে ঋতুমতী হতাম কিন্তু আমাদের সালাত কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।' [বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ, ১/৩১৫]

"বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হয়।"[৮৫]

ড. আজাদ অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামকে গুলিয়ে ফেলেছেন। অন্যান্য ধর্মের অমানবিক বিধান দেখে, তিনি মনে মনে ইসলামকে নিয়ে একটা আইডিয়া তৈরি করেছেন। এরপর সে আইডিয়া থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছেন। আসলে কুরআন-হাদীস ঘেঁটে সত্যকে বের করে আনার মতো ক্ষমতা তার ছিল না। তাই একটি আয়াত আর দুটো হাদীসকে পুঁজি করেই তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। সে যাই হোক, আমরা ড. আজাদের অনুসারীদের বলব—দলিলের আলোকে আপনারাই বিচার করুন আপনাদের শ্রদ্ধাভাজন আজাদকে। যিনি অতি অল্প জ্ঞান নিয়ে ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যাচার করেছেন।

---

৮৫. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ, ১/৬০৭; আলবানি, *সহীহ আত-তিরমিযি*, ১/১১০

০৪

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র

"তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো।"[৮৬]

নাস্তিকদের বেশির ভাগই এই আয়াতটির মনগড়া ব্যাখ্যা করে থাকে। ড. আজাদও সেটার ব্যতিক্রম করেননি। তিনি এই আয়াতটিকে ব্যবহার করে বোঝাতে চেয়েছেন, ইসলাম পুরুষকে নারীজাতির প্রতি স্বেচ্ছাচারী করে করে তুলেছে। নারীকে বানিয়েছে পুরুষের জমি। তিনি বলেন,

> *"সব ধর্মেই নারী অশুভ, দূষিত, কামদানবি। নারীর কাজ নিষ্পাপ স্বর্গীয় পুরুষদের পাপবিদ্ধ করা; এবং সব ধর্মেই নারী সম্পূর্ণ মানুষ। নারী কামকূপ, তবে সব ধর্মই নির্দেশ দিয়েছে যে নারী নিজে কাম উপভোগ করবে না, রেখে দেবে পুরুষের জন্যে; সে নিজের রন্ধ্রটি একটি অক্ষত টাটকা সতীচ্ছেদে মুড়ে তুলে দেবে পুরুষের হাতে। পুরুষ সেটি ইচ্ছামতো ভোগ করবে, নিজের জমি যেভাবে ইচ্ছা চষে বেড়াবে। ইসলামে নারী সম্পর্কে এই ধারণাই পোষণ করে।"*[৮৭]

ওপরের আয়াতটি এখানেই শেষ নয়, এর পরেও কিছু অংশ রয়েছে। আয়াতটির বাকি অংশ হলো :

وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"আর নিজেদের জন্যে আগামী দিনের ব্যবস্থা করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে

৮৬. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২২৩
৮৭. হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, পৃষ্ঠা : ৮২

থাকো। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে, আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সুসংবাদ জানিয়ে দাও।"[৮৮]

✱ আয়াতটির প্রকৃতপক্ষে কী অর্থ নির্দেশ করে?

এই আয়াতটি কি সত্যি তা-ই বোঝায়, যেটি নাস্তিকরা ভাবে? প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে, আল কুরআন নবি ﷺ-এর ওপর একদিনে নাযিল হয়নি। সময়ের সাথে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান জানিয়ে ধাপে ধাপে কুরআন নাযিল হয়েছে। যেমন ধরুন, সাহাবারা যখন নবি ﷺ-কে আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন, তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।"[৮৯]

আবার সাহাবিরা যখন মদ ও মাদকদ্রব্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তা-ই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা

---

৮৮. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২২৩
৮৯. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৮৬

চিন্তা করতে পারো।"[৯০]

ইহুদিরা যখন রুহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে জানতে চেয়েছে, তখন আল্লাহ ﷻ নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে রুহ সম্পর্কে অবহিত করেছেন :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

"তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন—রুহ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।"[৯১]

এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন সূরা নাযিল হতে থাকে। রাসূলের ২৩ বছরের নবুয়্যতের জীবনে কখনো একটি আয়াত, কখনো আয়াতের অংশ, কখনো একাধিক আয়াত, আবার কখনো পূর্ণ সূরা ওহি আকারে অবতীর্ণ হয়। ফলে এক একটি আয়াত অথবা এক একটি সূরা নাযিলের পেছনে রয়েছে আলাদা আলাদা প্রেক্ষাপট। তাই কেউ যদি কোনো আয়াত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই সেই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট জানতে হবে।

■ "তাদের নিকটবর্তী হোয়ো না" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

আমাদের আলোচনা যেহেতু 'সূরা আল-বাকারাহ' এর ২২৩ নং আয়াত নিয়ে, তাই আমরা আয়াতটির শানে নুযূল জানার চেষ্টা করব। ইন শা আল্লাহ, আয়াতটির শানে নুযূল জানলেই আজাদের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তবে আয়াতটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে হলে, এর আগের আয়াত নিয়েও একটু আলোচনা করতে হবে। কেননা, পূর্বের আয়াতটি (২২২) এই আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্বের আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"আর তারা তোমাকে ঋতু সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বলো তা কষ্টকর। সুতরাং তোমরা

৯০. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২১৯

৯১. সূরা বানী ইসরাঈল : ৮৫

> ঋতুকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হোয়ো না। অতঃপর তারা যখন পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদের পছন্দ করেন।”[৯২]

আমাদের আলোচনা হবে ২২২ নং আয়াতের শেষাংশ হতে ২২৩ নং আয়াতের সমাপ্তি পর্যন্ত। এখান থেকে—“...সুতরাং তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হোয়ো না। অতঃপর তারা যখন পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদের পছন্দ করেন। তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো। আর নিজেদের জন্যে আগামী দিনের ব্যবস্থা করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে, আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সুসংবাদ জানিয়ে দাও।”—এই পর্যন্ত।

আল্লাহ ﷻ ২২২ নং আয়াতে মহিলাদের হায়েজকালীন অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছ। তিনি এই সময়ে স্বামী ও স্ত্রীর যৌনমিলন হারাম করেছেন। সাথে সাথে তিনি হারাম করেছেন স্ত্রীর গুহ্যদ্বার (Anus) ব্যবহার করা অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে পায়ুকাম (Buggery) করা। স্ত্রী যখন ঋতু থেকে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন স্বামী তার সাথে যৌনমিলন করতে পারবে সেভাবে, যেভাবে আল্লাহ ﷻ নির্দেশ প্রদান করেছেন। কীভাবে আল্লাহ ﷻ নির্দেশ দিয়েছেন—এই ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের কয়েকটি মতামত আপনাদের সামনে তুলে ধরছি,

> মুজাহিদ ﵀ আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেন, “এর অর্থ হচ্ছে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে এবং মলদ্বার থেকে দূরে থাকবে।”

> ইবরাহীম ﵀ বলেন, “এর অর্থ মিলনের স্থান শুধু স্ত্রী অংশ (যোনি/Vagina)।”

> ইবন আব্বাস ﵄ বলেন, “এর অর্থ তাদের নিকট পবিত্র অবস্থায় গমন করবে, ঋতুকালে নয়।”

---

৯২. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২২২

আবু রাযীন ﷺ বলেন, "এই আয়াতের অর্থ তাদের নিকট পবিত্রতার সময় গমন করবে।"

ইকরিমা ﷺ বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে তখন তাদের নিকট গমন করবে যখন তারা গোসল করে পবিত্র হবে।"

কাতাদাহ ﷺ বলেছেন, "পবিত্রতার সময় স্ত্রীদের নিকট গমন করবে।"

আবার কেউ কেউ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এর অর্থ হলো তোমরা হালাল উপায়ে বিবাহের মাধ্যমে তাদের সাথে গমন করবে।"[১৩]

ওপরের মতামত থেকে এ কথা বুঝতে পারি যে, স্বামীর জন্যে হারাম হচ্ছে তার স্ত্রীর সাথে পায়ুকাম করা এবং ঋতুকালীন যৌনমিলন করা। সাথে এও অনুধাবন করতে পারি যে, স্ত্রীর সাথে স্বামীর যৌনমিলনের একমাত্র পথ হবে যোনি (Vagina)। যোনি ছাড়া পায়ুপথে মিলন হারাম। তাহলে ২২২ নং আয়াত যৌনমিলনের সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে, আর ২২৩ নং আয়াত নির্ধারণ করেছে পদ্ধতি।

❋ নারীদের কেন শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা হলো?

এবার ২২৩ নং আয়াতের প্রথমাংশের দিকে তাকাই, যেখানে বলা হয়েছে—"তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত্র"। আজাদের মতো অনেক ইসলামবিদ্বেষীই এই অংশটুকুর সমালোচনা করে। কেননা, এখানে স্ত্রীকে শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আমরা সেসব জ্ঞানপাপীদের বলব, কোনো কিছুকে উপমার মাধ্যমে উপস্থাপন করাটা কি অন্যায়? মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে মহান আল্লাহ ﷻ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপমা প্রদান করেছেন।[১৪] সূরা বাকারাহর ২২৩ নং আয়াতে আল্লাহ ﷻ উপমা হিসেবে নারীদের শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করেছেন।

এখন প্রশ্ন হলো নারীদের কেন শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা হলো? যারা ভ্রূণবিদ্যার (Embryology) সামান্যতমও জ্ঞান রাখেন, তারা জানেন—পুরুষের

---

১৩. তাবারি, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর, *তাফসীর : জামিউল কুরআন,* ৪/১৬০

১৪. আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

"নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়।" [সূরা কাহাফ, ১৮ : ৫৪]

গর্ভে সন্তানধারণ অসম্ভব। তবে সন্তানধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে পুরুষের শুক্রাণু (Sperm)। পুরুষের স্খলিত শুক্রাণু নারীদেহে স্থানান্তর লাভ করে। এরপর নিষিক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের মাধ্যমে নারীদেহে এক নতুন জীবনের সূচনা ঘটে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়া থেকে শুরু করে, মানবশিশু জন্ম নেওয়া পর্যন্ত অনেকগুলো ধাপ অতিক্রান্ত হয়, আর এর সবগুলোই নারীদেহে ঘটে। নিচে অতি সংক্ষেপে সে ধাপগুলো উপস্থাপন করা হলো :

রঙিন ছবি বইয়ের ১৫৬ নাম্বার পাতায় দেখুন
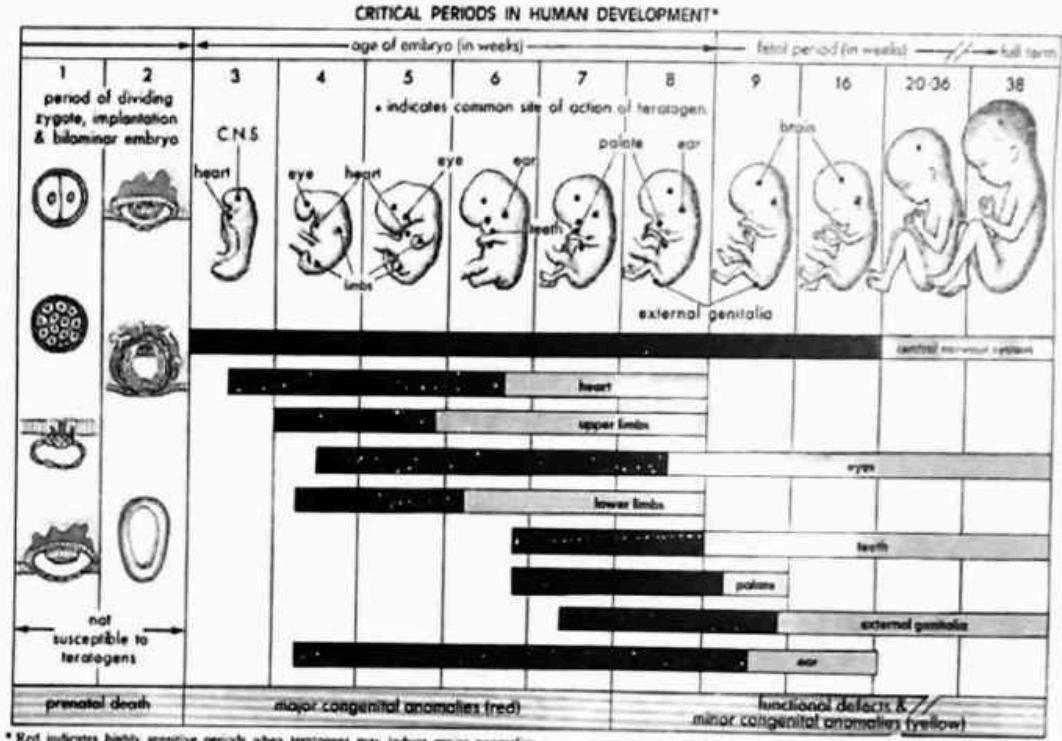
চিত্র : ভ্রূণ বেড়ে ওঠার ধাপসমূহ

■ মানবশিশু বৃদ্ধির জটিল ধাপসমূহ

Fertilization :

প্রাথমিক যৌনমিলনের মাধ্যমে পুরুষের দেহ হতে শুক্রাণু নারীদেহে পৌঁছায়। পুরুষের দেহ থেকে একই সাথে প্রায় ১৫-২০০ মিলিয়ন শুক্রকীট (spermatozoa) নিঃসৃত হয়। তার মধ্যে প্রায় ১০০০ শুক্রাণু ফ্যালোপিয়ান টিউবে পৌঁছায়। এর মধ্যে মাত্র ২০০ শুক্রাণু নিষেকের (fertilization) জন্যে ডিম্বাণুর নিকট পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু ডিম্বাণু (ovum) নিষিক্ত হওয়ার জন্যে শুধু একটি পরিপক্ক শুক্রাণুর দরকার হয়। এই একটি শুক্রাণুকে ডিম্বাণুর সাথে নিষিক্ত হওয়ার জন্যে তিনটি পর্দাকে ভেদ

(penetrate) করতে হয়। পর্দা তিনটি হলো : Corona radiate, Zona pellucida, Oocyte cell membrane.

এভাবে তিনটি পর্দা ভেদ করার পর শুক্রাণুটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং ডিম্বাণুটি পুরুষের শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণের (zygote) সূচনা হয়। নিষেকের পরে ডিম্বাণু তার মিয়োসিস (Meiosis) সম্পন্ন করে। ২৩ ক্রোমসোম (Chromosome)-বিশিষ্ট ডিম্বাণু ও ২৩ ক্রোমসোমবিশিষ্ট শুক্রাণু নিষিক্ত হয়ে ৪৬টি ক্রোমোসোমের সৃষ্টি করে। এরপর শুরু হয় প্রি-এমব্রায়োনিক পিরিয়ড (Preembryonic period)।

Preembryonic period :

I. Cleavage : ১ম ক্লিভেজ (cleavage) ঘটে নিষেকের ৩০ ঘণ্টা পর। মাইটোসিস কোষ বিভাজন ৩ দিন ধরে অনবরত চলতে থাকে। নিষিক্ত কোষ ক্রমান্বয়ে ছোট ছোট হয়ে বিভাজিত হতে শুরু করে। প্রতিটি বিভাজিত কোষকে blastomere বলে।

II. Morula : ৭২ ঘণ্টা পর নিষিক্ত ডিম্বাণু জরায়ুতে (Uterus) প্রবেশ করে। একে মরুলা বলা হয়।

III. Blastocyst : মরুলা ৪-৫ দিন যাবৎ অনবরত বিভাজিত হতে থাকে। যা পর্যায়ক্রমে ১০০ তে গিয়ে পৌঁছায়, এদের blastocyst বলে। Blastocyst অনান্তরিক (hollow) এবং তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। এর প্রাচীরগাত্রকে বলা হয় ট্রফোব্লাস্ট (Trophoblast) যা প্লাসেন্টা তৈরিতে সাহায্য করে।

IV. Implantation : নিষেকের ১০ দিন পর blastocyst এন্ডোমেট্রিয়াম এর ভেতরে প্রোথিত হতে শুরু করে। এটি ১ সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে।

V. Primative Streak : যখন মানবভ্রূণের বৃদ্ধির বয়স ১৫-১৬ দিন হয় তখন এই ধাপ শুরু হয়। ২য় সপ্তাহের শেষের দিকে এসে hypoblastic কোষগুলো পুচ্ছ সম্বন্ধীয় অঞ্চলে চলে আসে এবং একটি লম্বা অনচ্ছতা (opacity) সৃষ্টি করে। একেই Primative Streak বলা হয়। এরপর এ থেকে তিনটি কোষের স্তর সৃষ্টি হয়, যা ectoderm, mesoderm, endoderm নামে পরিচিত। Ectoderm থেকে চামড়া ও স্নায়ুতন্ত্র তৈরি হয়। Mesoderm

থেকে কঙ্কালতন্ত্র, পেশি, রক্ত সংবহনতন্ত্র, মুত্রতন্ত্র এবং প্রজননতন্ত্র তৈরি হয়। Endoderm থেকে পরিপাকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, প্রজননতন্ত্রের কিছু অংশ তৈরি হয়।

Embryonic Stages :

এটি ১৬ দিন বয়সে শুরু হয়, যা কয়েকটি ধাপে বিভক্ত।

I. Neurula : স্নায়ুতন্ত্র ভ্রূণের বৃদ্ধির সহায়তাকারী অন্যতম প্রধান তন্ত্র। এই ধাপে এসে মস্তিষ্ক তৈরি হয় সেই সাথে spinal cord ও রক্ত সংবহনতন্ত্র তৈরি হয়। একটি সরল হৃৎপিণ্ড এ সময়ে রক্তপ্রবাহের সৃষ্টি করে, যা ভ্রূণকে বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবারহ করে।

II. Embryonic Membrane : এই ধাপে ভ্রূণের চারপাশে ভ্রূণীয় মেমব্রেন তৈরি হয়। যেমন : amnion (bag of waters), chornion (it becomes principal part of the placenta)।

III. Tailbud : এটি ৫ সপ্তাহ বয়সে শুরু হয়। এই সময়ে ভ্রূণের আকার একটি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেটের মতো হয়। এই ধাপকেই tailbud বলা হয়।

IV. Metamorphosis : এটি ৬ সপ্তাহে শুরু হয় এবং কমপক্ষে ২ সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। এই ধাপে এসে অঙ্গুলিসহ দুই হাত-পা তৈরি হয়। ইন্দ্রিয়তন্ত্র এ সময়ে গঠিত হয়। চোখে পিগমেন্ট লেয়ার চলে আসে।

- **Fetal Stages**

ফিটাস সব ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারণ করে। এই পর্যায়ে এসে মা ও সন্তানের মধ্যে সব ধরনের সংবহন শুরু হয়, ফিটাস মাতৃদেহ হতে তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি লাভ করে। ২য় মাসে এসে কোমলাস্থিগুলো ক্রমান্বয়ে শক্ত হতে থাকে। ৩য় মাসে এসে ফিটাসে হাতের ও পায়ের আঙুলে নখ তৈরি হয় এবং চুল গজায়। কিডনি সচল হতে শুরু করে এবং তার বিভিন্ন কার্যাবলি শুরু করে। এই ধাপে এসে বাচ্চা তার মুখ খুলতে পারে। চতুর্থ মাসে এসে বাচ্চার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। বাচ্চা জরায়ুতে নড়াচাড়া শুরু করে। পঞ্চম মাসে এসে বাচ্চা মায়ের পেটে লাথি দিতে সক্ষম হয়। এই ধাপে বাচ্চা তার আঙুল নাড়াচাড়া শুরু করে, হেঁচকি প্রদান করে এবং ঘুমাতে পারে।

ছয় মাস বয়সে এসে তার শরীরে তৈলাক্ত গ্রন্থির উৎপত্তি ঘটে। সাত মাস বয়সে এসে বাচ্চা তার শরীরের তাপমাত্রা, বৃদ্ধি, গ্রাস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই সাথে তার মস্তিষ্ক বৃদ্ধি ঘটে। অষ্টম মাসে চোখ আলো বুঝতে পারে, ঘ্রাণ নিতে পারে কিন্তু কানের স্নায়ু পরিপূর্ণভাবে তখনো বেড়ে উঠে না। নবম মাসে এসে ফিটাসের বৃদ্ধি পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়। বাচ্চাটি তখন নতুন পৃথিবীতে আসার উপযোগিতা অর্জন করে। এই বয়সে সে তার মায়ের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। আর দশম মাসে এসে সে পৃথিবীতে তার নতুন জীবনের যাত্রা শুরু করে।[১৫]

■ বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের ধাপসমূহ

এবার আমরা একটু শস্যক্ষেত্রের দিকে নজর দেবো। শস্যক্ষেত্রে একটা বীজ কীভাবে অঙ্কুরোদ্গম হয়? আমরা অতি সংক্ষেপে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের বিষয়টা ব্যাখ্যা করছি:

প্রথম ধাপে এসে বীজ পানি দ্বারা পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় ধাপে পানি বীজে গিয়ে বীজের অভ্যন্তরস্থ এনজাইমকে সচল করে। ফলে বীজের উদ্গম শুরু হয়। পানি অভিগমনের জন্যে বীজ থেকে মূলের জন্মের মাধ্যমে তৃতীয় ধাপ শুরু হয়। চতুর্থ ধাপে বীজের অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয় এবং তা সূর্যের আলোর দিকে যেতে থাকে। পঞ্চম ধাপে অঙ্কুরোদ্গমের পর আস্তে আস্তে পাতার সূচনা হয় এবং photmorphogenesis শুরু হয়। এভাবে আলোর প্রভাবে অঙ্কুর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ওয়াটারি ইম্বাইবিশানের মাধ্যমে বীজের ভেতরে পানি প্রবেশ করে। এই পানি বীজের অভ্যন্তরস্থ এনজাইম যেমন : অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজকে অ্যাকটিভ করে। এসব এনজাইমের মাধ্যমে ডাইজেশান ধাপ শুরু হয়। এনজাইম বীজের সঞ্চিত খাদ্য (প্রোটিন ও স্টার্চ) ভাঙা শুরু করে। শুরু হয় এম্ব্রায়োনিক ডেভোলপমেন্ট। এ সময়ে বীজের ড্রাই মেটার কমতে শুরু করে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বীজ তার সঞ্চিত খাবার থেকে পুষ্টি নিচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার যে খাবার উৎপন্ন হয় তা জলবিশ্লেষণ হয়ে Epicotyl, Hypocotyl, Radicle এবং Plumule-এ পৌঁছায় Cotyledon দিয়ে। Gibberellic acid এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, এটা অঙ্কুরোদ্গম ও কচি চারা গজানোর প্রক্রিয়াকে সহজ করে। এরপর সিডিলিং গ্রোথ

১৫. ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়তে পারেন : T.W Sadler, *Lungman's Medical Embryology*; R.G Harrison, *A Textbook of Human Embryology;* Rani Kumar, *Textbook of Human Embryology.*

এবং এস্টাবলিশমেন্ট ধাপ শুরু হয়। এমার্জ হওয়া সিডলিং বড় হতে থাকে। এটা আবার দু-ধরনের। ১. ইপিজিয়াল, ২. হাইপোজিয়াল। ইপিজিয়ালের ক্ষেত্রে কটাইলিডনকে (Cotyledon) সাথে নিয়ে চারা ওপরের দিকে ওঠে। আর হাইপোজিয়ালের ক্ষেত্রে কটাইলিডন মাটির নিচেই থাকে। পরবর্তীকালে চারা বড় হলে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

রঙিন ছবি বইয়ের ১৫৬ নাম্বার পাতায় দেখুন
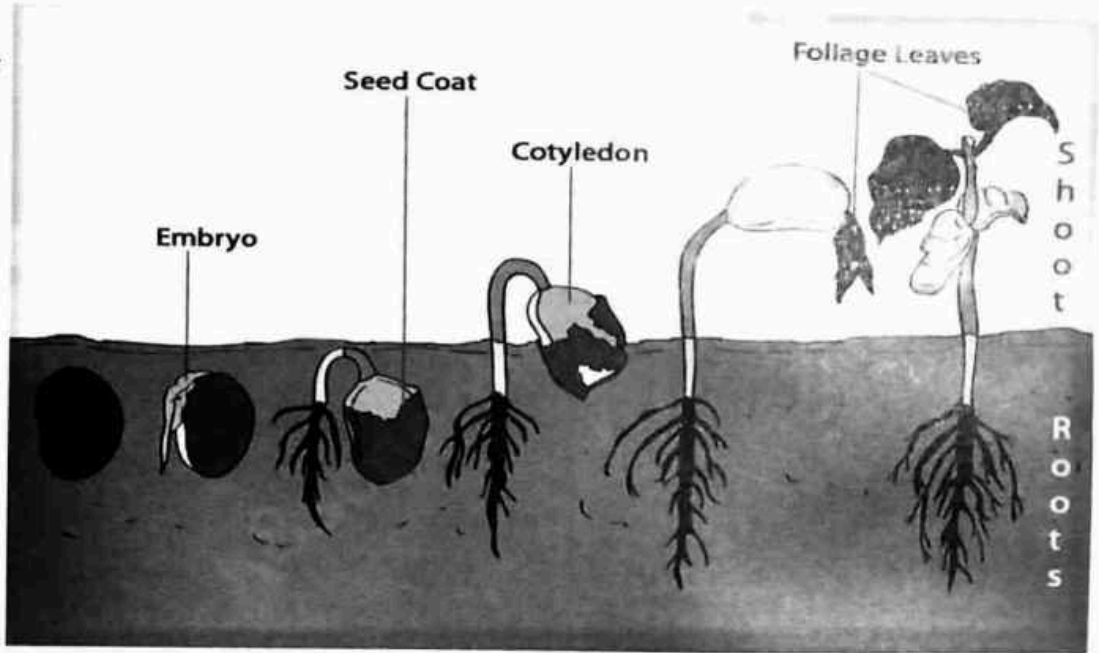
চিত্র : বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম

এভাবে একটি শস্যক্ষেত্রে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। বীজ থেকে ফসল ফলে। শস্যক্ষেত্রে যেমন উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে জীবনের সঞ্চার ঘটায়, তেমনিভাবে নারীদেহও শুক্রাণুর সাহায্যে জীবনের উদ্ভব ঘটায়। শস্যক্ষেত্র হতে যেমন বীজ তার বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান লাভ করে, ঠিক তেমনি মাতৃদেহ থেকেও একটি শিশু তার জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান লাভ করে থাকে। একটি শস্যক্ষেত্রে যেমন শস্য লাগালে সেখান হতে জীবনের উদ্ভব ঘটে, ঠিক তেমনি প্রজননক্ষম একটি পরিপক্ক শুক্রাণু, ডিম্বাণুর সংস্পর্শে এলে নারীগর্ভে নতুন মনুষ্যজীবের উদ্ভব ঘটে। তাই নারীদেহ একটি শস্যক্ষেত্রের মতো—কুরআনের এই দাবি অযৌক্তিক নয়; বরং যৌক্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত।

❋ কুরআন কি পুরুষকে সহিংস করে তুলছে নারীজাতির ওপর?

এখন বাকি রইল এই আয়াতের ওপর উত্থাপিত অভিযোগের দ্বিতীয় অংশ। যেখানে

বলা হয়েছে—"অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো।" এই আয়াতাংশ প্রকৃতপক্ষে কী বোঝাচ্ছে? এই আয়াত কি পুরুষকে সহিংস করে তুলছে নারীজাতির ওপর? কেড়ে নিচ্ছে নারীর স্বাধিকার? নারীকে পুরুষের কাছে করে তুলছে অসহায়? চলুন একটু সামনে আগাই।

চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসারে এ কথা প্রমাণিত নয় যে, স্বামী যদি স্ত্রীর সামনের দিক হতে যোনিতে মিলন না করে পার্শ্ব পরিবর্তন যোনিতে মিলন করে, তবে সন্তান ট্যারা কিংবা বিকলাঙ্গ হবে। কিন্তু ইহুদিরা মনে করত—স্বামী যদি পেছন দিক হতে স্ত্রীর যোনিতে সহবাস করে, তবে সন্তান ট্যারা হবে। তখন সাহাবিরা রাসূল ﷺ-এর কাছে ইহুদিদের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অন্য বর্ণনা থেকে জানা যায়—ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার মুহাজির সাহাবাগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মক্কা হতে আগত একজন মুহাজির সাহাবি মদীনার একজন আনসারি মহিলাকে বিয়ে করেন। বিয়ের রাতে স্ত্রীকে তার ইচ্ছামতো সহবাসের প্রস্তাব প্রদান করেন। কিন্তু স্ত্রী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন যে, আমি ওই একটি নিয়ম[১৬] ছাড়া অন্য কোনো নিয়মে সহবাস করার অনুমতি দেবো না। কথা বাড়তে বাড়তে একসময় তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে গিয়ে পৌঁছয়। অতঃপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১৭]

এই আয়াতের মাধ্যমে এটি সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে যে, স্বামী ও স্ত্রী তাদের বৈবাহিক জীবনের একে অপরের সাথে যেকোনো পন্থায় মিলিত হতে পারবে; কিন্তু মিলিত হওয়ার স্থান একই হতে হবে অর্থাৎ যোনি (Vagina)। চলুন, এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের মতামত জেনে নিই।

> ইবন আব্বাস ﵁ বলেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকট সামনের দিক হতে কিংবা পেছনের দিক হতে মিলিত হতে পারো। তবে মলদ্বার ও ঋতুস্রাব ব্যতীত তাদের নিকট গমন করতে হবে।"

> উবাই ইবনু কা'ব ﵁ বলেন, "এর অর্থ স্বামী তার স্ত্রীর নিকট যোনিতে দাঁড়িয়ে, শুয়ে, কাত হয়ে, সামনে কিংবা পেছনের দিক হতে গমন করতে পারবে।"

---

১৬. সামনের দিক হতে যোনিতে মিলন।

১৭. তাবারি, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর, *তাফসীর : জামিউল কুরআন*, ৪/১৭০-১৭১; ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ২/২১৯-২২১; সুয়ূতি, জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর, *তাফসীরে জালালাইন*, ১/৪৮৫; সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন*, ২/২৪০; মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *তাফসীরে নূরুল কুরআন*, ২/২৮১-২৮২

কাতাদাহ ﵀ বলেন, "এর অর্থ দাঁড়িয়ে, বসে, কিংবা একপাশ থেকে যেভাবে ইচ্ছা স্বামী তার স্ত্রীর নিকট গমন করতে পারে। তবে তার স্ত্রী-অঙ্গ (যোনি) ব্যতীত অন্যদিকে সীমালঙ্ঘন করতে পারবে না।"

ইবনু জাফর তাবারি ﵀ বলেন, "আমরা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস ﵄-এর মতামতকেই শুদ্ধ বলে মনে করি, পক্ষান্তরে অন্যান্য ব্যাখ্যাকে গ্রহণযোগ্য মনে করি না। যে ব্যক্তি উক্ত আয়াতের মাধ্যমে মলদ্বারে গমনকে প্রমাণ করতে চায়, প্রকাশ্যত তা নির্ঘাত ভুল। অথচ আল্লাহ শস্যক্ষেত্রে গমন করার নির্দেশ দিয়েছেন। মলদ্বারে যেহেতু শস্য উৎপাদন হয় না, তাই তা শস্যক্ষেত্রে নয়। তাই তা গমনস্থল হতে বিরত থাকতে হবে।"[৯৮]

মলদ্বারে গমন যে হারাম, এ ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৯৯] ইসলামবিদ্বেষীরা অযথাই এই আয়াতকে ব্যবহার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তারা বলতে চায়, আয়াতটি পুরুষকে নারীর ওপর স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছে। যেভাবে খুশি সেভাবে স্ত্রীকে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছে। অথচ আমরা দেখেছি, আয়াতটি তাদের দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ নির্দেশ করেছে। আয়াতটি পুরুষকে সংযমী করেছে। উগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক পুরুষ যেন নারীকে কষ্ট প্রদান না করে, সে জন্যে মলদ্বার গমন নিষেধ করেছে। আয়াতটি শেষের দিকে এ কথাও বলে দিয়েছে, "আর নিজেদের জন্যে আগামী দিনের ব্যবস্থা করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে, আল্লাহর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সুসংবাদ জানিয়ে দাও।"

আয়াতটিকে যদি কেউ বাস্তবতার সাথেও মেলায়, তবুও নাস্তিকদের দাবি ভুল বলেই প্রমাণিত হবে। কেননা, একজন বিবেচনাবোধসম্পন্ন চাষী কখনোই শস্যক্ষেত্রকে অবহেলা করে না। অযত্ন করে দূরে ঠেলে রাখে না। বরং সে বীজ লাগানোর সময় থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত নিজের সন্তানের মতো করে শস্যক্ষেত্রের পরিচর্যা করে। তাই শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা মানেই যাচ্ছেতাই আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া, এই দাবি বাস্তবতা বিবর্জিত।

---

৯৮. তাবারি, *তাফসীর : জামিউল কুরআন,* ৪/১৬৮-১৬৯; ইবনু কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,* ২/২২৯

৯৯. রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্ত্রীর মলদ্বারে সংগম করল অথবা গণকের নিকটে গেল এবং সে (গণক) যা বলল, তা বিশ্বাস করল; সে অবশ্যই মুহাম্মাদের ওপর নাযিলকৃত জিনিসের (কুরআন কারীম) বিরুদ্ধাচরণ করল।" [আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : পবিত্রতা ও তার সুন্নাহ, হাদীস নং : ৬৩৯; *মিশকাতুল মাসাবীহ,* অধ্যায় : পাক-পবিত্রতা, হাদীস নং : ৫৫১]

০৫

জাহিলি যুগে নারী অধিকার

জর্জ হেগেল বলেছিলেন, "ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না।" হুমায়ুন আজাদও এ ক্ষেত্রে তেমনটাই করেছেন। জাহিলি আরবের ইতিহাস থেকে তিনি শিক্ষা নেননি। বরং জাহিলি যুগকে তিনি প্রমোট করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, জাহিলি যুগে আরবে নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও সম্মান বেশি ছিল। সমাজে তাদের বেশি মূল্যায়ন করা হতো। আরবে ইসলাম যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন নারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য অধিকার হরণ করা হয়।

> *"আরব নারীদের নানা ইতিহাস লেখা হয়েছে; সবগুলোতেই স্বীকার করা হয় যে ইসলামপূর্ব আরবে অনেক বেশি ছিলো নারীদের স্বাধীনতা ও অধিকার। তারা অবরোধে থাকতো না, অংশ নিতো সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে; এমনকি তাদের প্রাধান্য ছিলো সমাজে।"*[১০০]

তিনি আরও বলেছেন, ইসলাম আসার আগে আরবের নারীদের অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রদান করা হয়, তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়।

> *"প্রচারের ফলে মুসলমানদের মধ্যে জন্মেছে এমন এক বদ্ধমূল ধারণা যে ইসলামপূর্ব আরবে নারীদের অবস্থা ছিলো শোচনীয়; ইসলাম উদ্ধার করে তাদের। প্রতিটি ব্যবস্থা পূর্ববর্তী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়; তবে ঐতিহাসিক ভাবে সাধারণত সত্য হয় না।"*[১০১]

---

১০০. হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, পৃষ্ঠা : ৮১

১০১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮১

"ইসলামের আগে আরবের নারীদের অবস্থা যতোটা খারাপ ছিল ব'লে প্রচারিত, ততোটা খারাপ ছিলো না; ঐতিহাসিকদের মতে নারী অনেক বেশি স্বাধীন ছিলো অন্ধকার যুগের আরবে।"[১০২]

মজার বিষয় হলো, এই আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ইতিহাস থেকে কোনো দলিল দিতে পারেননি। কোনো ঐতিহাসিকের মতামতও আনতে পারেননি। শুধু একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেটাও এই ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে ব্যবহার করার অযোগ্য।

❋ কুরআনে বর্ণিত জাহিলি যুগে নারীদের অবস্থা

আমরা আমাদের আলোচনা শুরুর পূর্বে এ কথাই বলব যে, এ ক্ষেত্রেও আজাদ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। বৃথা আস্ফালন করেছেন। নারীদের স্রষ্টার মনোনীত দ্বীন থেকে দূরে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। তিনি হয়তো ভেবেছেন, তার নিজস্ব চিন্তাধারা এবং মিথ্যা বক্তব্যের দ্বারা মুসলিম নারীরা সহজেই বিভ্রান্ত হবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায়, আমাদের সামনে মুসলিম জাতির বিশুদ্ধ ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে। আমাদের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে লাভ নেই। বিভ্রান্ত করার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামের বিশুদ্ধ ইতিহাস ও সেই সাথে অমুসলিম ঐতিহাসিকদের মতামত থেকেই দেখাব যে, ইসলাম আগমনের পূর্বে আরব জাতির সামাজিক অবস্থা কতটা বর্বর ছিল। সেই সময়ে নারীরা কেমন অবহেলিত হতো। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝٥٨ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝٥٩

"আর যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে (কন্যাকে) রেখে দেবে? নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে? সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা কতই-না নিকৃষ্ট!"[১০৩]

---

১০২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৬৯

১০৩. সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৫৮-৫৯

❋ ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত তৎকালীন নারীদের দুর্দশা

এই আয়াত অত্যন্ত পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ইসলামপূর্ব আরবের নারীরা কতটা অপমানিত হতো। কতটা লাঞ্ছনার শিকার হতো। যে সময় যখন পিতাদের কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়ার খবর দেওয়া হতো, তখন তারা লজ্জায় মুখ লুকিয়ে রাখত। তাদের মনের মধ্যে ক্রোধ সৃষ্টি হতো। আর ক্রোধের আগুন মেটাতে গিয়ে শেষমেশ কন্যাসন্তানকে জীবিত দাফন করে ফেলত। তাদের কাছে কন্যাসন্তান ছিল অপয়া। সমাজের বোঝা।[১০৪] একটি ছোট্ট নমুনা পেশ করছি :

> "বানু তামীম এবং কোরায়শদের মধ্যে কন্যা হত্যার সমধিক প্রচলন ছিল। তারা এ জন্যে রীতিমতো গর্ববোধ করত এবং তাদের জন্যে সম্মানের প্রতীক বলে বিশ্বাস করত। কোনো কোনো পরিবারে এ পাষণ্ডতা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, মেয়েরা যখন বেশ বড় হয়ে যেত এবং মিষ্টি কথা বলতে শুরু করত, তখন পাঁচ-ছয় বছর বয়সে তাকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করে পিতা তাকে লোকালয়ের বাইরে নিয়ে যেত। পাষণ্ড পিতারা পূর্বেই সেখানে গিয়ে গর্ত খুঁড়ে আসত এবং পরে মেয়েকে সেখানে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দিত। অবোধ মেয়ে তখন অসহায় অবস্থায় চিৎকার করে করে বাবার কাছে সাহায্য চাইত। কিন্তু পাষণ্ড পিতা তার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে, ঢিল ছুড়ে ছুড়ে তাকে হত্যা করত। অথবা জীবন্ত মাটিচাপা দিয়ে নিজ হাতে কবর সমান করে দিয়ে নির্বিকারে ঘরে ফিরে আসত। আর আপন কলিজার টুকরো সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার জন্যে সে রীতিমতো গর্ববোধ করত। বানু তামীমের কায়স ইবন আসিম এভাবে একে একে তার দশটি কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করে। কন্যা হত্যার এ অমানুষিক বর্বরতা থেকে আরবের কোনো কবীলাই মুক্ত ছিল না। তবে কোনো কোনো এলাকার কবীলায় এটি অনেক বেশি হতো, আবার কোনো কোনো কবীলায় তা কম হতো।"[১০৫]

❋ হাদীস থেকে বর্ণনা

চলুন এবার হাদীস থেকে দেখি যে, সে সময়ে সাধারণ নারীদের ওপর কী ধরনের অত্যাচার করা হতো। আয়িশা ﷺ বলেছেন,

> "জাহিলি যুগে চার প্রকারের বিয়ে প্রচলিত ছিল। এক প্রকার হচ্ছে, বর্তমান যে ব্যবস্থা চলছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার অভিভাবকের নিকট তার

---

১০৪. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর : ফী যিলালিল কুরআন*, ১২/১০৬-১০৮

১০৫. নজিবাদি, আকবর শাহ খান, *ইসলামের ইতিহাস* : ১/৬৮

অধীনস্থ মহিলা অথবা তার কন্যার জন্যে বিবাহের প্রস্তাব দেবে এবং তার মোহর নির্ধারণের পর বিবাহ করবে।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে মুক্ত হওয়ায় পর এই কথা বলত যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার সাথে যৌনমিলন করো। এরপর স্বামী তার নিজ স্ত্রী থেকে পৃথক থাকত এবং কখনো একই বিছানায় ঘুমাত না যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হতো, যার সাথে যৌনমিলন করত। এটা ছিল তার স্বামীর অভ্যাস। এতে উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে সে একটি উন্নত জাতের সন্তান লাভ করতে পারে। এ ধরনের বিবাহকে 'নিকাহুল ইসতিবদা' বলা হতো।

তৃতীয় প্রথা ছিল, দশজনের কম কিছু ব্যক্তি একত্র হয়ে পালাক্রমে একই মহিলার সাথে যৌনমিলন করত। যদি মহিলা এর ফলে গর্ভবতী হতো এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পর যখন কিছুদিন অতিবাহিত হতো, তখন সেই মহিলা এই সকল ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাত এবং কেউই আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। যখন সকলেই সেই মহিলার সামনে একত্র হতো তখন সে তাদের বলত, তোমরা সকলেই জানো—তোমরা কী করেছ। এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি, সুতরাং হে অমুক, এটা তোমারই সন্তান। ওই মহিলা যাকে খুশি তার নাম ধরে ডাকত। তখন এ ব্যক্তি উক্ত শিশুটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত এবং ওই মহিলা তার স্ত্রী হিসেবে গণ্য হতো।

চতুর্থ প্রকারের বিবাহ হচ্ছে, বহু পুরুষ একই মহিলার সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হতো এবং ওই মহিলা তার কাছে যত পুরুষ আসত, কাউকে শয্যাশায়ী করতে অস্বীকার করত না। এরা ছিল পতিতা। যার চিহ্ন হিসেবে ওরা নিজেদের ঘরের সামনে পতাকা উড়িয়ে রাখত। যে কেউ ইচ্ছা করলে এদের সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হতে পারত। যদি এই সকল মহিলার মধ্য থেকে কেউ গর্ভবতী হতো এবং কোনো সন্তান প্রসব করত, তাহলে যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়া সকল পুরুষ এবং একজন কাফাহকে (কাফাহ এমন একজন বিশেষজ্ঞ, যারা সন্তানের মুখ অথবা শরীরের কোনো অঙ্গ দেখে বলতে পারত—এটি অমুকের ঔরসজাত সন্তান) ডেকে আনা হতো। সে সন্তানটির যে লোকটির সাদৃশ্য দেখতে পেত, তাকে বলত—এটি তোমার সন্তান। তখন ওই লোকটি ওই সন্তানকে নিজের হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। এবং লোকজন ওই সন্তানকে তার সন্তান হিসাবে আখ্যা দিত এবং সে এই সন্তানকে অস্বীকার করতে পারত না। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্য দ্বীনসহ পাঠানো হলো, তখন তিনি জাহিলি যুগের সমস্ত বিয়েপ্রথাকে বাতিল করে দিলেন এবং বর্তমানে

প্রচলিত বিয়েব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিলেন।"[১০৬]

তৎকালীন আরব অভিজাত বংশের নারীদেরই কেবল সম্মান করা হতো, তাদের কথা সমাজে গৃহীত হতো, তাদের রক্ষায় যুদ্ধ হতো, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু নিম্ন বংশীয় নারীরা কেবল পুরুষের মনোরঞ্জন-সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতো। তাদের পতিতা বানানো হতো। অপরদিকে নারী দাসীদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। তাদের ছিল না কোনো সমাজস্বীকৃত অধিকার। ছিল না কোনো মর্যাদা। তাদের সাথে তাদের যে কেউ অনায়াসেই যৌনাচারে লিপ্ত হতো। সমাজের কেউ কিছুই বলত না।

ব্যভিচার এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, সমাজের কোনো স্তরের লোকেরাই তা থেকে মুক্ত ছিল না। অবশ্য কিছুসংখ্যক নারী পুরুষ—নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকার কারণে—ব্যভিচার থেকে বিরত থাকত। জাহিলি যুগে অজস্র স্ত্রী রাখা দোষের কিছু ছিল না। দুই সহোদর বোনকে তারা একই সাথে বিয়ে করত। পিতার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী অথবা পিতার মৃত্যুর পর সন্তান তার সৎমায়ের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতো। তালাকের ওপর শুধু পুরুষের একচ্ছত্র অধিকার ছিল। তাদের স্ত্রী গ্রহণ করার যেমন কোনো সীমা ছিল না (কেউ কেউ দশের অধিক বিয়ে করত), ঠিক তেমনি তালাকেরও কোনো নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। যখন যাকে খুশি বিয়ে করত। যখন যাকে খুশি তালাক দিত। এতে নারীরা কোনো ধরনের আপত্তি তুলতে পারত না। এমনকি কোনো ধরনের বিচার চাইতে পারত না।[১০৭]

❋ অমুসলিম লেখকদের কলমে

নাস্তিকরা হয়তো বলতে পারে, এগুলো তো মুসলিমদের লেখা বইয়ের রেফারেন্স। এখানে তো পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হতে পারে। নাস্তিকদের এই দাবিও আমাদের সামনে টিকবে না ইন শা আল্লাহ। কারণ, এখন আমরা ওই সময়কার জাহিলি সমাজ সম্পর্কে অমুসলিম ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের বক্তব্যও উপস্থাপন করব। অমুসলিম ঐতিহাসিক Edward Gibbon (১৭৮৪-১৭৮১) তাঁর বিখ্যাত বই *The Decline and fail of the Roman Empire*-এ তৎকালীন আরব জাতির বর্বরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

"In this primitive and abject state, which ill deserves the

১০৬. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : বিয়ে, ৮/৪৭৫১
১০৭. মুবারকপুরি, *শফিউর রহমান, আর রাহীকুল মাখতুম*, পৃষ্ঠা : ৬০-৬৪

name of society, this human brute, without arts and laws, almost without sense and language, is poorly distinguished from the rest of the animal creation."[১০৮]

"তাদের এই আদিম বর্বর ব্যবস্থা ছিল সমাজ নামের কলঙ্ক। এ ব্যবস্থার শিল্পকলা, আইনকানুন, ভাষা ও জ্ঞান বিবর্জিত মানুষরূপী পশুগুলোকে অন্যান্য ইতর জীব থেকে আলাদা করা কঠিন।"

আরেক ইসলামবিদ্বেষী লেখক Robert Spencer (১৯৬২-বর্তমান), যিনি তার গোটা জীবনে ইসলামের বিরোধিতায় ব্যয় করছেন, তিনি আরবদের তৎকালীন অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

"Pagan Arabia was a rough land. Blood feuds were frequent, and the people had grown to be as harsh and unyielding as their desert land. Women were treated as chattel; child marriage (of girls as young as seven or eight) and female infanticide were common, as women were regarded as a financial liability."[১০৯]

"পৌত্তলিক আরব ছিল রুক্ষভূমি। সেখানকার লোকজন মরুভূমির মতো অত্যন্ত একরোখা ও কর্কশ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠত। রক্তগত শত্রুতা যুগের পর যুগ ধরে চলত। সেখানকার নারীদের অস্থাবর সম্পত্তি মনে করা হতো। বাল্যবিবাহ (যেসব নারীদের বয়স ৭ অথবা ৮) এবং কন্যাশিশু হত্যা ছিল তাদের কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার। নারীরা সমাজে বোঝা হিসেবে বিবেচিত হতো।"

এই হলো পৌত্তলিক আরবের সামাজিক অবস্থার কিছু বর্ণনা। আরবের তৎকালীন ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, তৎকালীন উচ্চ বংশীয় নারীরা ছাড়া সমাজের অন্যান্য স্তরের নারীদের অবস্থা একেবারেই শোচনীয় ছিল। তাদের ছিল না কোনো সমাজস্বীকৃত অধিকার। ছিল না কোনো সামাজিক মর্যাদা। তারা পুরুষের যৌনসামগ্রী হিসেবেই বিবেচিত হতো।

❋ ইসলাম সকল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে বাতিল বলে ঘোষণা করে

কিন্তু ইসলাম আগমনের পর তাদের এই ধরনের সকল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে

১০৮. Edward Gibbon, *The Decline and fail of the Roman Empire*, 2/50.
১০৯. Robert Spencer, *The Truth About Muhammad*, p.34

বাতিল বলে ঘোষণা করে। একসাথে ৪টির বেশি স্ত্রী রাখাকে হারাম করে।[১১০] নারী দাসীদের দিয়ে যৌন ব্যবসাকে হারাম করে। নারীদের সম্পত্তিতে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে। মোটকথা, একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, বোন হিসেবে তার প্রাপ্য অধিকারকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেক পুরুষকে তার অধীনস্থ নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাদের মাল-ইজ্জতের হিফাযত করা, তাদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করা ইত্যাদিকে বাধ্যতামূলক করে। সাথে সাথে সকল ধরনের কন্যাশিশু হত্যা করাকে মহাপাপ বলে আখ্যায়িত করে। ইসলামের উদাত্ত বাণী নিয়ে কুরআন ঘোষণা করে :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ۝٩

"আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাসন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে—কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।"[১১১]

কুরআন আরও পরিষ্কার করে ঘোষণা করে :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কোরো না। আমিই তাদের রিযিক দিই এবং তোমাদেরও। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মহাপাপ।"[১১২]

সাথে সাথে কুরআন এও উল্লেখ করে :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۝١٨٧

"তারা (নারীরা) তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরা তাদের অঙ্গাবরণ।"[১১৩]

অন্যত্র আরও বলা হয় :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١

---

১১০. সূরা আন-নিসা, ৪ : ৩

১১১. সূরা আত-তাকবীর, ৮১ : ০৮-০৯

১১২. সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৩১

১১৩. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৮৭

"আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্যে যারা চিন্তা করে।"[১১৪]

যে সমস্ত দাসীরা তাদের সমাজে তাদের মালিকের নিগ্রহের স্বীকার ছিল, যে সমস্ত দাসীদের দিয়ে তাদের মালিকেরা দেহব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করত, ইসলাম তাদের রক্ষায়ও পদক্ষেপ নেয়। কুরআন প্রকাশ্যে ঘোষণা করে :

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٣٣﴾

"তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে, তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদের কামনায় তাদের ব্যভিচার করতে বাধ্য কোরো না।"[১১৫]

ইসলাম আগমনের পর নারীদের জাহিলি সমাজের সমস্ত অবর্ণনীয় খারাপ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ প্রদান করা হয়। তাদের মর্যাদার আসনে আসীন করা হয়। তাদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রদান করা হয়। তাদের মা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। তাদের স্ত্রী হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। তাদের কন্যা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। তাদের সমাজের একেবারে নিচু পর্যায় থেকে, নিগৃহীত পর্যায় থেকে ইসলাম ওপরে তুলে আনে।

তাই আমরা বলতে চাই, নিরপেক্ষ মন নিয়ে কেউ যদি ইসলামপূর্ব আরবের ইতিহাস অধ্যয়ন করে, তাহলে তার কাছে এটা সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হবে যে, ইসলামপূর্ব আরব নারীদের জন্যে কতটা হুমকি ছিল, যা ইসলাম আসার পর দূরীভূত হয়। সেই সাথে আজাদসহ নাস্তিকদের বলতে চাই, আপনারা আগে ভালো করে ইসলামপূর্ব আরবের ইতিহাস অধ্যয়ন করুন। তারপর সমালোচনা করতে আসুন। নিরপেক্ষ মন নিয়ে ইসলামপূর্ব আরবের ইতিহাস যাচাই করুন, এরপর লক্ষ করুন ইসলাম নারীকে কতটা সম্মান দিয়েছে, যা জাহিলি যুগের আরবরা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

❋ ইতিহাসের বিখ্যাত ঘটনা

মনে পড়ে গেল ইতিহাসের সেই বিখ্যাত ঘটনা। আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন মদীনার

১১৪. সূরা আর-রুম, ৩০ : ২১
১১৫. সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩৩

রাষ্ট্রপ্রধান, তখনকার কথা। কোনো এক মুসলিম নারী বনু কায়নুকার বাজারে দুধ বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। দুধ বিক্রি করার পর তিনি তার প্রয়োজনে এক স্বর্ণকারের দোকানে গিয়েছিলেন। স্বর্ণকার ছিল ইহুদি। ওই ইহুদি মুসলিম নারীকে দেখার জন্যে তার চেহারাকে অনাবৃত করতে বলেছিল। কিন্তু ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়প্রাপ্ত নারী সাহসিকতার সাথে ইহুদির কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।

লম্পট ইহুদি তার কামনা চরিতার্থ করার জন্যে মুসলিম নারীটির কাপড়ের একাংশ তার পিঠের সাথে গিঁট বেঁধে দিয়েছিল। যার ফলে ওই নারী দাঁড়ানোর সাথে সাথে তার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে গিয়েছিল। তার লজ্জাস্থান দেখে যখন ইহুদিরা হাসছিল আর মজা করছিল, তখন সেই নারী অপমান বোধ করে চিৎকার করছিল। সেখানে উপস্থিত একজন মুসলিম ওই বোনের ইজ্জতের হিফাযতের জন্যে ইহুদিদের বাজারেই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল।[১১৬]

আমরা তো সেই জাতি, যে জাতি তার মুসলিম বোনের ইজ্জত রক্ষার জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করি না। আর আমাদেরই যদি বলা হয়, আমরা নারীদের স্বাধীনতা হরণ করেছি, তখন সেই অভিযোগ কতটা হাস্যকর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

ইসলামের সমালোচনাকারী আজাদ ও ভক্তদের প্রতি আমাদের কথা এটাই, আপনারা ভালো করে জাহিলি যুগের আরবদের ইতিহাস পাঠ করুন। তারপর তুলনা করে দেখুন—ইসলামপূর্ব আরবে নারীরা বেশি স্বাধীন ছিল, না ইসলাম আগমনের পর নারীরা বেশি স্বাধীন ছিল? ইসলামপূর্ব আরবে নারীরা কি সুযোগ-সুবিধা বেশি ভোগ করত, নাকি ইসলাম আসার পর তারা তাদের প্রাপ্য অধিকার পায়? যদি মুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস নাও পড়তে চান, অসুবিধা নেই। অমুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস পড়ুন। পড়লেই বুঝতে পারবেন, পার্থক্যটা কোথায়। আর যদি পড়াশোনা না করে শুধু শুধু গৎবাঁধা মিথ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চান, তো জেনে রাখুন—সত্যকে কখনো ঢেকে রাখা যায় না। সত্যের জয় সুনিশ্চিত।

---

১১৬. মুবারকপুরি, *আর রাহীকুল মাখতুম*, পৃষ্ঠা : ২৬২

০৬

ইসলামে নারী

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমাবিশ্ব খুবই শোরগোল করছে। যার সূত্র ধরে ইসলামবিরোধী অপশক্তিগুলোও ইসলামের ওপর কালিমা লেপনের চেষ্টায় আদাজল খেয়ে নেমেছে। অধিকার কিংবা স্বনির্ভরতার টোপ ফেলে মুসলিম রমণীদের মাঠে-ময়দানে টেনে আনার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বাস্তবতার মাথা খেয়ে একদল স্বার্থান্ধ লোক এদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলছে। যেমনটা আজাদ বলেন,

> *"পুরুষ সম্পর্কে উচ্চ ও নারী সম্পর্কে নিম্ন ধারণা ইসলাম পেয়েছে ইহুদি-খ্রিষ্টান ঐতিহ্য থেকে; এবং তাকে বদ্ধমূল ক'রে তুলেছে... ইসলামে নারী সম্পর্কে রয়েছে যে-অবিশ্বাস, তা বিশেষভাবে আরববিশ্বাস; আরবরা সম্ভোগপরায়ণ... ইসলামে একজন নারী সে যতোই অসাধারণ হোক, একজন পুরুষের, সে যতোই তুচ্ছ অপদার্থ পাশবিক হোক, অর্ধেক... ইসলামে পুরুষ নারীর থেকে তুলনাহীনভাবে শ্রেষ্ঠ, এবং নারী হচ্ছে কামসামগ্রী— পৃথিবী থেকে বেহেশত পর্যন্ত।"*[১১৭]

> *"পুরুষ ও নারী ইসলামে ব্যক্তি হিসেবে প্রভু ও দাসী।... এবং এ ধর্মেও নারীকে নির্দেশ করা হয়েছে কামসামগ্রীরূপে"*[১১৮]

> *"শরিয়া আইনের উৎস কোরান ও সুন্নাহ, এ-আইন ঐশী। তবে এতে প্রাকইসলাম আরবের নানা রীতির মধ্য থেকে বিশেষ কিছু রীতিকে বেছে নিয়ে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে ইসলামি রীতি বা আইনরূপে। প্রাকইসলাম আরবের সে-সমস্ত রীতিই*

১১৭. হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, পৃষ্ঠা : ৮২
১১৮. *নারী*, পৃষ্ঠা : ৮৩

গৃহীত হয়েছে ইসলামে, যা খর্ব করে নারীর অধিকার; যা আগের স্বাধীন নারীকে পরিণত করে পুরুষের দাসীতে। ইসলামী আইন বিবর্তনশীল নয়, তাই দেশেদেশে মুসলমান নারীর মৌলিক অধিকার চোদ্দ শো বছর আগে যা ছিলো, এখনো তাই আছে...।[১১৯]

❋ আজাদের ভ্রান্তি

হুমায়ূন আজাদ কিছুটা বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছেন। কেননা, এর আগের অধ্যায়েই আমরা দেখলাম তিনি বলেছেন—ইসলামপূর্ব আরবে নারীদের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি ছিল, ইসলাম আসার পরে তা হরণ করা হয়। আবার এখানে বলছেন, ইসলাম প্রাক-ইসলাম আরবের রীতিনীতিই গ্রহণ করেছে। ইসলাম যদি প্রাক-ইসলামি রীতিনীতিই গ্রহণ করে (যদিও ইসলাম সেটা করেনি) তবে তো তার উচ্চবাচ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই! কেননা, ইসলামপূর্ব আরবে নারীরা যেহেতু অনেক অধিকার পেত, আর ইসলাম সে রীতিকেই বহাল রেখেছে (!), তবে তো সেটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করার কোনো মানেই হয় না! এটা গেল একটা দিক। আরেকটা দিক হলো—তিনিই বলছেন, আরবরা সম্ভোগপরায়ণ ছিল। তারা নারীদের ইচ্ছেমতো সম্ভোগ করত। তাহলে কীভাবে তৎকালীন নারীরা স্বাধীন ছিল? আর কীভাবেই বা সামাজিকভাবে বেশি অধিকার ভোগ করত?

পুরুষদের ইচ্ছামতো নারী ভোগ করাটাকেই তিনি নারী অধিকার মনে করেন কি না, তা আমাদের বোধগম্য নয়। সত্যি কথা বলতে কী, আজাদ এখানে এসে নিজেই ফেঁসে গেছেন। একদিকে তিনি বলছেন আরবের পুরুষরা নারীদের সম্ভোগ করত; আবার তিনিই বলছেন, নারীরা বেশি অধিকার ও স্বাধীনতা পেত! পাশাপাশি এও বলছেন, ইসলাম আরবের সেই পুরোনো রীতিনীতিগুলোই বহাল রেখেছে! আমরা জানি না, অ্যালকোহল পান করা অবস্থায় তিনি কথাগুলো লিখেছিলেন কি না! যেহেতু তিনি অ্যালকোহল অ্যাডিক্টেড ছিলেন[১২০], তাই আমাদের এই ধারণা সত্যিও হতে পারে।

---

১১৯. *নারী*, পৃষ্ঠা : ৮৪

১২০. তিনি যে অ্যালকোহল অ্যাডিক্টেড ছিলেন, সে কথা কারও অজানা নয়। তিনি নিজেই বলেছেন, *"মদ্যপান একেবারেই খারাপ নয়; আমি খাই, শামসুর রাহমান খান এবং খায় লাখ লাখ বাঙালি... এ অসুস্থতা থেকে উঠে আসতে হবে মুসলমানকে; মদকে মনে করতে হবে একটি পানীয়, যা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ পান করে।"* [*আমার অবিশ্বাস*, পৃষ্ঠা : ১৪৬]

✸ নারী অধিকারের ইশতেহার

ইতিপূর্বে আমরা জাহিলিয়াতের যুগে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে জেনেছি। নারী নিগৃহীত হওয়ার এক করুণ চিত্র সেখানে ফুটে উঠেছে। তাই জাহিলি যুগে নারীদের স্বাধীনতা বেশি ছিল, এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম এসে জাহিলি যুগের সকল কুসংস্কারকে ধুয়েমুছে সাফ করে আরব সমাজকে কলুষতা মুক্ত করেছে। ইসলাম এমন কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে, যা বিশ্বকে বিস্মিত করেছে। জাহিলি যুগে নারী-বিষয়ক যত কুসংস্কার ছিল, ইসলাম তার সবগুলোই মূলোৎপাটন করেছে। সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে নারী অধিকারের ইশতেহার উপস্থাপন করেছে।

- বিয়ে ও সম্পত্তির অধিকার :

জাহিলি যুগে তালাকের পর কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীরা পছন্দানুযায়ী বিয়ে করতে পারত না। ফলে তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামীহারা নারীকে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হতো। ইসলাম তাদের এ দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদের পূর্বের স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির

ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান কোরো না।[১২১] এ উপদেশ তাকেই দেওয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কিয়ামাত দিনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এটি তোমাদের জন্যে একান্ত পরিশুদ্ধ ও অধিক পবিত্র। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।"[১২২]

জাহিলি যুগে তাদের পৈত্তিক সম্পত্তি ও মিরাস হতে বঞ্চিত করা হতো। ইসলাম উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে তাদের অধিকার নিশ্চিত করে।[১২৩] আল্লাহ ﷻ বলেন :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧

"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ

---

১২১. এ আয়াত থেকে অনেকেই 'হিল্লা বিয়ে'র বৈধতা প্রমাণ করতে চান। আসুন, হিল্লা বা হীলা বিয়ে সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু বিষয় জেনে নেয়া যাক। হীলা (حيلة) শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো—কৌশল, উপায়, ফন্দি, ছলচাতুরি, প্রতারণা ইত্যাদি। প্রচলিত অর্থে 'হীলা' বা 'হিল্লা'র অর্থ হলো : 'কোনো স্বামীর তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে এ শর্তে বিয়ে করা যে, বিয়ের পর সহবাস শেষে স্ত্রীকে তালাক দেবে, যেন সে পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হয়, সে তাকে পুনরায় বিয়ে করতে পারে।' ইসলামবিদ্বেষীরা এই 'হীলা বিয়ে' নিয়ে বরাবরের মতোই চরম মূর্খতার পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা এটাকে ইসলামের বিধান হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে। অথচ বাস্তবতা হলো ইসলাম এ ধরনের বিয়েকে চরমভাবে নিষিদ্ধ করেছে। আবু হুরাইরাহ ؓ বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ হিল্লাকারী এবং যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে লানত করেছেন।' [আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং : ৮২৭০; সনদ হাসান]]

উকবা ইবনু আমির ؓ থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'আমি কি তোমাদের ভাড়াটে পাঠা সম্পর্কে বলব?' তারা বলল, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন : 'হিল্লাকারী।' এরপর তিনি আরও বলেন : 'আল্লাহ হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন।' [হাকিম, *আল-মুসতাদরাক*, হাদীস নং : ২৭৩১; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং : ১৯৩৬; দারাকুতনি, *আস-সুনান*, হাদীস নং : ৩৫৭৬; সনদ হাসান।]

এক ব্যক্তি হাসান আল-বাসরি ؓ-এর কাছে এসে বলল, 'আমার বংশের এক লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, এখন সে ও তার স্ত্রী লজ্জিত, আমি ইচ্ছা করছি আমি তাকে বিয়ে করি, মোহর প্রদান করি, এরপর তার সাথে মিলিত হই, যেরূপ স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়। এরপর আমি তাকে তালাক দিই (যাতে প্রথম স্বামী ওই মহিলাকে আবার বিয়ে করে নিতে পারে)। হাসান আল-বাসরি ؓ তাকে বলেন, 'হে যুবক, আল্লাহকে ভয় করো! তুমি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে জাহান্নামের পেরেকে পরিণত হোয়ো না।' এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ؓ বলেন, وهذا يقتضي شهرة ذلك بين المسلمين زمن الصحابة 'এথেকে প্রমাণ হয় যে, হিল্লার নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সাহাবাদের যুগে মুসলমানদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল।' [ইবনু তাইমিয়্যা, *ইকামাতুদ দালিল আলা ইবতালিত তাহলিল*, ৩/৪৯৪, শামেলাহ সংস্করণ।] ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ؓ তাঁর উপর্যুক্ত গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তর আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপারে সাহাবাদের ইজমাও বর্ণনা করেছেন।—শারঈ সম্পাদক।

১২২. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৩২

১২৩. উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীরা পুরুষের অর্ধেক পায়। কেন পায়, এ বিষয়ে *সংবিৎ* বইতে আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে আর আলোচনা করতে চাচ্ছি না। কেউ চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। (*সংবিৎ*, পৃষ্ঠা : ১০৫-১১৯)

আছে; অল্প হোক কিংবা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত।”[১২৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ ﴿١١﴾

“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন—একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। তবে যদি কন্যাগণ দুয়ের অধিক হয়, তবে তাদের জন্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ। আর যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক।”[১২৫]

জাহিলি যুগে নারীরা নিজেদের ধন-সম্পদ ভোগ করতে পারত না। মোহরানার টাকা পর্যন্ত স্বামীরা আত্মসাৎ করে নিত। তারা অযাচিত হস্তক্ষেপের শিকার হতো। কিন্তু ইসলাম নারীদের ওপর অনধিকারচর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে। প্রাপ্ত সম্পত্তিকে নারীদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার অধিকার প্রদান করে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা কোরো না এমন সব বিষয়ের, যাতে আল্লাহ তোমাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর তোমরা আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে অবগত আছেন।”[১২৬]

■ বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদানের অধিকার :

বিচারাধীন বিষয়ে বিচারক নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ

১২৪. সূরা আন-নিসা, ৪ : ৭
১২৫. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১১
১২৬. সূরা আন-নিসা, ৪ : ৩২

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান করো, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক ন্যায়সংগতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেওয়া। এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশকম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সংগতভাবে লেখাবে। দুজন সাক্ষী করো তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। ওই সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদের তোমরা পছন্দ করো, যাতে একজন যদি ভুলে যায় তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা কোরো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধকরণ আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান করো, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখো। কোনো লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত কোরো না। যদি তোমরা এরূপ করো, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় করো, তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব বিষয়ে অবগত।"[১২৭]

১২৭. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৮২

■ **স্ত্রীর প্রতি সুবিচার নিশ্চিতকরণ :**

জাহিলি যুগে নারীরা স্বামীর পক্ষ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশুভ আচরণের মুখোমুখি হতো। অনেক স্বামী তাদের স্ত্রীকে তালাকও দিত না, আবার স্ত্রী হিসেবে মেনেও নিত না। ঝুলিয়ে রাখত। ইসলাম স্ত্রীদের সাথে এ ধরনের অশালীন ও অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

"আর তোমরা যতই কামনা করো না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ কখনো করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা (একজনের প্রতি) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পোড়ো না, যার ফলে তোমরা (অপরকে) ঝুলন্তের মতো করে রাখবে। আর যদি তোমরা মীমাংসা করে নাও এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১২৮]

■ **খাদ্যদ্রব্যের জাহিলিয়াত দূরীভূতকরণ :**

জাহিলি যুগে কিছু কিছু খাদ্য শুধু পুরুষরাই ভক্ষণ করতে পারত, নারীদের জন্যে তা নিষিদ্ধ ছিল। ইসলাম এ ধরনের বৈষম্য দূরে ঠেলে ঘোষণা করে :

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾

"আর তারা বলে, এই পশুগুলোর পেটে যা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্যে হারাম। আর যদি তা মৃত হয়, তবে তারা সবাই তাতে শরীক। শিগগিরই তিনি তাদেরকে তাদের কথার প্রতিদান দেবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী।"[১২৯]

■ **অধিক বিয়ের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ :**

জাহিলি যুগে বিয়ের কোনো সুনির্ধারিত সংখ্যা ছিল না। পুরুষ তার ইচ্ছামতো যত খুশি বিয়ে করতে পারত। কারও কারও স্ত্রীর সংখ্যা শতাধিক হয়ে যেত। কিন্তু ইসলাম

১২৮. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১২৯
১২৯. সূরা আনআম, ৬ : ১৩৯

এমন বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। একসাথে সর্বোচ্চ চারটি বিয়ের অনুমতি প্রদান করে। যার ফলে পুরুষদের জন্যে যা ইচ্ছা তা-ই করার যে প্রবণতা অব্যাহত ছিল, সেটি নিয়মনীতির আওতায় চলে আসে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

"আর যদি তোমরা ভয় করো যে, এতিমদের হক সুবিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্যে থেকে তোমাদের পছন্দমতো দুটি, তিনটি কিংবা চারটি বিয়ে করে নাও। আর যদি এরূপ আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সংগত আচরণ করতে পারবে না, তবে একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের; এটা আরও উত্তম। এটি অবিচার না করার নিকটবর্তী।"[১৩০]

তাদের সমাজে সহোদর বোনকে একসাথে বিয়ে করার প্রচলন ছিল। কিন্তু ইসলাম একে অবৈধ করে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝٢٣

"তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদের, তোমাদের মেয়েদের, তোমাদের বোনদের, তোমাদের ফুফুদের, তোমাদের খালাদের, ভাতিজিদের, ভাগ্নিদের, তোমাদের সেসব মাতাকে যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোনদের, তোমাদের শাশুড়িদের, তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ সেসব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদের, আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলিত না হয়ে থাকো তবে তোমাদের ওপর কোনো পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদের এবং দুই বোনকে একত্র করা (তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা।

১৩০. সূরা আন-নিসা, ৪ : ৩

নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৩১]

তাদের মধ্যে আরেকটি বর্বরতা ও কুসংস্কার বিরাজ করছিল যে, সন্তান বাবার স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারত। এ ধরনের ঘৃণিত কাজটি তাদের সমাজে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতো না। ইসলাম এ কাজটিকে চিরতরে রহিত করে দেয়। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"আর তোমরা বিয়ে কোরো না নারীদের মধ্য থেকে যাদের বিয়ে করেছে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ। তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে, নিশ্চয় তা অশ্লীলতা ও ঘৃণিত বিষয় এবং নিকৃষ্ট পথ।"[১৩২]

■ তালাকের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ :

জাহিলিয়াতের যুগে তালাকের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না। পুরুষরা ইচ্ছামতো তালাক প্রদান করত। কিন্তু ইসলাম তালাককে নিয়ন্ত্রণ করে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

"তালাকে দুবার; তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর তাদের কাছ থেকে নিজের দেওয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্যে জায়েয নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোনো পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই

১৩১. সূরা আন-নিসা, ৪ : ২৩
১৩২. সূরা আন-নিসা, ৪ : ২২

একে অতিক্রম কোরো না। বস্তুত যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই যালিম।"[১৩৩]

■ কন্যাসন্তান হত্যা চিরতরে অবৈধ ঘোষণা :

এই বিষয়ে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে।

■ যিনা-ব্যভিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা :

জাহিলি যুগে যিনা-ব্যভিচার দূষণীয় ছিল না। ইসলাম এসব যাবতীয় অপকর্ম হতে নারীদের বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ۝٣٢

"আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।"[১৩৪]

■ দাসীদের অধিকার :

আমরা আগেই বলেছি, জাহিলি যুগে দাস-দাসীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের না ছিল সামাজিক মর্যাদা, না ছিল সমাজস্বীকৃত কোনো অধিকার। সে সময়ে তারা পশু হিসেবে বিবেচিত হতো। মনিবরা তাদের দাসীদের সাথে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করত। অনেক মালিক তার দাসীর মাধ্যমে পতিতাবৃত্তি করিয়ে অর্থ উপার্জন করত। ইসলাম দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেয়। রাসূল ﷺ বলেন,

"জেনে রাখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন তাকে নিজে যা খায় তা-ই তাকে খাওয়ায় এবং নিজে যা পরিধান করে, তাকেও তা-ই পরায়। তাদের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দিয়ো না, যা তাদের জন্যে অধিক কষ্টদায়ক।"[১৩৫]

দাসীদের দিয়ে পতিতাবৃত্তি করিয়ে টাকা উপার্জনকে হারাম আখ্যা দেওয়া হয়। আল্লাহ ﷻ বলেন :

---

১৩৩. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২২৯

১৩৪. সূরা ইসরা, ১৭ : ৩২

১৩৫. বুখারি, *মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল,* আস-সহীহ, অধ্যায় : ঈমান, হাদীস নং : ৩০

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

"তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদের ব্যভিচারে বাধ্য কোরো না। যদি কেউ তাদের ওপর জোরজবরদস্তি করে, তবে তাদের ওপর জোরজবরদস্তির পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৩৬]

নিজের দাসী ছাড়া অন্যের দাসী, এমনকি স্ত্রীর দাসীর সাথেও যৌন-সম্পর্ক করাটাও অবৈধ। অপরদিকে নিজের বিবাহিত দাসীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকানোকেও হারাম করা হয়। রাসূল ﷺ বলেন,

"তোমাদের কেউ যদি তার দাসকে তার দাসীর সাথে বিয়ে দেয়, তবে সে যেন আর তার দাসীর যৌনাঙ্গের দিকে দৃষ্টিও না দেয়।"[১৩৭]

দাসীদের বিয়ের মাধ্যমে মুক্ত করে দিতে হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে দ্বিগুণ পুরস্কার পাওয়া যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তি দাসীকে উত্তমরূপে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে, সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।"[১৩৮]

এভাবে ইসলাম দাসীদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। তাদের প্রতি সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছে, ভালো আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাদের মুক্ত করে বিয়ে করতে উৎসাহ দিয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন গুনাহের (যেমন : ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করা, সাওম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা, আল্লাহর নামে শপথ করে শপথ রক্ষা না করা ইত্যাদি) কাফফারা হিসেবে দাসমুক্তির ব্যবস্থা করেছে।[১৩৯]

আমরা এখানে মাত্র নয়টি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি। এমন আরও উদাহরণ রয়েছে, যেখানে ইসলাম জাহিলি রীতিকে পদতলে পিষ্ট করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে নারীমুক্তির ইশতেহার বাস্তবায়ন করেছে। এরপরেও যদি কেউ বলে, জাহিলি যুগের

---

১৩৬. সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩৩

১৩৭. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আসআশ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ, হাদীস নং : ৪১১৫

১৩৮. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : গোলাম মুক্ত করা, হাদীস নং : ২৩৭৬, ২৩৭৯

১৩৯. দাসপ্রথা নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে পড়তে পারেন : *সত্যকথন* বইয়ের হোসাইন শাকিলের লেখা "ইসলামে দাসপ্রথা" প্রবন্ধটি। (*সত্যকথন*, পৃষ্ঠা : ১৩৭-১৬৫)

বিধানকে ইসলাম নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, তখন তাকে মূর্খ বলা ছাড়া আমাদের উপায় থাকে না।

❋ ইসলামে নারীদের অবস্থান

ইসলাম জাহিলি যুগে বিরাজমান নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের নিষ্পত্তি ঘটায় এবং নারীদের মর্যাদার আসনে সমাসীন করে। তাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ ফিরিয়ে দেয়। নারীকে মা হিসেবে, কন্যা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে উপযুক্ত সম্মান প্রদান করে। নারীকে পুরুষের এবং পুরুষকে নারীর পরিপূরক হিসেবে ঘোষণা করে। এখন আমরা ইসলামে নারী-পুরুষের অবস্থান নিয়ে সামান্য আলোকপাত করব ইন শা আল্লাহ, যাতে ইসলামবিদ্বেষীদের মিথ্যা দাবিগুলো—ইসলাম সর্বদা নারীকে পুরুষের নিচে স্থান দিয়েছে, নারীকে পুরুষের চেয়ে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ মনে করেছে, নারীকে নিম্নশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছে ইত্যাদি—কিছুটা স্পষ্ট হয়।

- চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে :

ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের মতোই স্বাধীন। তারা তাদের ইচ্ছামতো ঈমান আনবে বা বিরত থাকবে। দ্বীন কবুল করার ক্ষেত্রে তাদের কেউ বাধ্য করতে পারবে না। আল্লাহ ﷻ বলেন :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত পৃথক হয়ে গেছে গোমরাহি থেকে। অতএব যে তাগুতকে (মিথ্যা উপাস্য) অস্বীকার করে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে আঁকড়ে ধরল মজবুত রশি, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সবই শোনেন এবং জানেন।”[১৪০]

মুসলিম হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই আল্লাহর বিধান মেনে চলা সমানতালে ফরয। হোক সে নারী কিংবা পুরুষ—আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিধান উভয়কেই মেনে চলতে হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

১৪০. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৫৬

أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার নেই। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।"[১৪১]

- আল্লাহর কাছে মর্যাদার ক্ষেত্রে :

আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত হওয়ার মানদণ্ড হলো তাকওয়া (আল্লাহভীতি)। যার তাকওয়া বেশি, সে-ই মহান আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত। চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। একজন নারী আল্লাহর কাছে পুরুষ হতেও অধিক শ্রেষ্ঠ হতে পারে, যদি তার তাকওয়া বেশি থাকে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"হে মানব, আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।"[১৪২]

- আমল ও সওয়াবের ক্ষেত্রে :

আমল ও সওয়াবের ক্ষেত্রে উভয়েই সমান। নারীরা যতটুকু আমল করবে ততটুকুর বদলা পাবে। আবার পুরুষরা যতটুকু আমল করবে ততটুকুর বদলা পাবে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"মুমিন অবস্থায় সে সৎ কাজ করবে—হোক সে পুরুষ বা নারী—আমি তাকে পবিত্র

১৪১. সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৬

১৪২. সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৩

জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।"[১৪৩]

কোনো পুরুষের প্রাপ্য বদলা থেকে যেমন তিল পরিমাণ বিনষ্ট করা হবে না, তেমনই কোনো নারীকেও তার প্রাপ্য বদলা থেকে তিল পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হবে না। প্রত্যেকেই তাদের কৃতকর্ম অনুসারে প্রতিফল পাবে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

"আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে যারা সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি তিল পরিমাণও যুলুম করা হবে না।"[১৪৪]

আল্লাহ ﷻ অন্যত্র বলেন :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

"অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দুআ (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, হোক সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। তোমরা পরস্পর এক। তারপর যারা হিজরত করেছে, যাদের নিজ দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং যাদের আমার রাস্তায় কষ্ট দেওয়া হয়েছে, আর যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে—অবশ্যই আমি তাদের ওপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব। এবং তাদের প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার তলদেশে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।"[১৪৫]

আমলের ক্ষেত্রে যত ফযীলত নির্ধারণ করেছে, তা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যে সমান। এমনটা নয় যে, পুরুষরা সালাত আদায় করলে বেশি সওয়াব পাবে, আর নারীরা কম। বরং যার সালাত বেশি সুন্দর হবে, সে-ই অধিক সওয়াবের অংশীদার

১৪৩. সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৯৭
১৪৪. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১২৪
১৪৫. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৯৫

হবে। এ ক্ষেত্রে একজন নারী যেমন একজন পুরুষকে অতিক্রম করে যেতে পারে, ঠিক তেমনই একজন পুরুষও একজন নারীকে অতিক্রম করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস লক্ষ করুন, নবি ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে এক শ বার পড়বে,

(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ)

'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। হামদ তাঁরই। তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।'

সে এক শ গোলাম আযাদ করার সাওয়াব অর্জন করবে এবং তার জন্যে এক শ নেকি লেখা হবে। আর তার এক শ গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এটা তার জন্যে রক্ষাকবচে পরিণত হবে এবং সেদিন তার চাইতে বেশি ফযীলতওয়ালা আমল আর কারও হবে না। তবে যে ব্যক্তি এ আমল তার চাইতেও বেশি করবে (তার কথা আলাদা)।"[১৪৬]

এভাবে যত ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে, সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান সমান। যে যত আমল করবে, তার আমলনামায় ততটাই সওয়াব জমা হবে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ বা নারী হওয়াটা কোনো ক্রেডিটের বিষয় নয়। আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

"নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ, সাওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী—তাদের জন্যে আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"[১৪৭]

---

১৪৬. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : দুআ, ৯/৫৯৬১

১৪৭. সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৫

■ উত্তম ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে :

নারী যখন মায়ের ভূমিকায় থাকবে, তখন উত্তম ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পিতার থেকে মাতার সম্মান ও মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আবু হুরায়রা ﵁ বলেন,

> "এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশি হকদার কে?' তিনি ﷺ বললেন, 'তোমার মা।' লোকটি বলল, 'তারপর কে?' তিনি ﷺ বললেন, 'তোমার মা।' সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি ﷺ বললেন, 'তোমার মা।' সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি ﷺ বললেন, 'তোমার বাবা।'"[১৪৮]

■ সন্তান হিসেবে :

পুত্রসন্তানের চেয়ে কন্যাসন্তানের ফযীলত অধিক পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে। কন্যাসন্তানের অভিভাবকগণকে অকল্পনীয় মর্যাদার অধিকারী হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন,

> "যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে, কিয়ামতের দিন সে এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি আর সে এ রকম থাকব (এরপর তিনি নিজের আঙুলসমূহ মিলিয়ে দেখালেন)।"[১৪৯]

কেউ যদি কন্যাসন্তান ঠিকঠাক পালন করে, তবে সে জান্নাতে নবি ﷺ-এর সাথে থাকবে। আর অপর হাদীস থেকে জানা যায়, কন্যাসন্তান কিয়ামাতের দিন পিতামাতা আর জাহান্নামের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। আয়িশা ﵂ বর্ণনা করেন,

> "একদিন আমার কাছে এক মহিলা এল। তার সাথে তার দুটি মেয়েও ছিল। মহিলাটি (আমার কাছে) কিছু চাইছিল। কিন্তু তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাকে খেজুরটা দিলাম। সে তা নিজের দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিলো। কিন্তু সে নিজে তা থেকে কিছুই খেলো না। এরপর সে উঠে চলে গেল। এ সময় রাসূল ﷺ আমার কাছে এলেন। আমি তাঁকে বিষয়টা খোলামেলা জানালাম। তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি এভাবে নিজের মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষার

---

১৪৮. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আচার-ব্যবহার, ৯/৫৫৪৬; বুখারি, *আল-আদাবুল মুফরাত,* হাদীস : ৩, ৫, ৬

১৪৯. মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ,* হাদীস নং : ২৬৩১; নাবাবি, মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনু শরাফ, *রিয়াদুস সালিহীন* : ১/২৭২

মুখোমুখি হবে এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, কিয়ামতের দিন তারা (মেয়েরা) তার জন্যে জাহান্নামের আগুনের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াবে।'"[১৫০]

- মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে :

নারীরা মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাবে। উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি তারাও মতামত দিতে পারবে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত চাইতেন।

মক্কা বিজয়ের আগে রাসূল ﷺ চৌদ্দ শ সাহাবির এক বিশাল জামাত নিয়ে কাবা অভিমুখে রওনা হন। উদ্দেশ্য ছিল মক্কায় ওমরা পালন করা। কিন্তু কুরাইশরা তাদের মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয়। ঘটনার একপর্যায়ে কাফিরদের সাথে তাদের সাথে সন্ধি হয়, যা হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। সে সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল—মুসলমানরা এই বছর হজ না করেই মদীনায় ফিরে যাবে এবং আগামী বছর এসে ওমরাহ পালন করবে। একবুক আশা নিয়ে সাহাবারা হজ পালনের জন্যে ইহরাম বেঁধেছিলেন, কিন্তু কুরাইশদের বাধার মুখে তাদের সব আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়। তাই তাঁরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

সন্ধিনামার শর্তাবলি ঠিক হলে রাসূল ﷺ সাহাবাদের কুরবানির পশু জবাই করার ও মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার অতলে ডুবন্ত মুসলমানরা চুপ করে বসে থাকে। আসলে তাঁরা চাইছিলেন রাসূল ﷺ যাতে সন্ধির শর্তগুলো নিয়ে আরেকবার ভাবেন। কিন্তু রাসূল ﷺ নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। সাহাবাদের নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখে তিনি উম্মে সালমা রা.-এর তাঁবুতে চলে গেলেন এবং তাকে বললেন, 'মুসলমানদের আদেশ দিচ্ছি অথচ তারা তা মানছে না।' উম্মে সালমা রা. তখন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যদি চান যে মুসলমানরা আপনার কথা মানুক, তাহলে কোনো কথা না বলে আপনি গিয়ে আপনার কুরবানির জন্তু জবাই করুন এবং একজন নাপিত ডেকে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলুন।' উম্মে সালমা রা. যা বললেন, রাসূল ﷺ তা-ই করলেন। নিজের কুরবানির জন্তু জবাই করলেন এবং নাপিত দিয়ে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেললেন। মুসলমানেরা এই দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল এবং একে একে কুরবানির পশু জবাই করার পর মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলল।[১৫১]

এভাবে একজন নারীর মতামত রাসূল ﷺ সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তার মতের

১৫০. মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং : ২৬২৯; নাবাবি, *রিয়াদুস সালিহীন*, ১/২৭৩
১৫১. বুখারি, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : শর্তাবলি, হাদীস নং : ২৭৩১-২৭৩২

প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে সকলেই তা বাস্তবায়ন করল। আর আল্লাহ তাঁর পরামর্শের মধ্যে কল্যাণ ও বরকত দান করলেন। ওহি নাযিলের সময় রাসূল ﷺ যখন ভীত হলেন, তখন খাদিজা রা. তাঁকে পরামর্শ দিয়ে বললেন,

> "আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবে না। কারণ, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখেন। সত্য কথা বলেন, অসহায় মানুষের সহায়তা করেন, মেহমানের মেহমানদারি করেন এবং অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ে সাহায্য করেন।"[১৫২]

ইসলাম পুরুষের পাশাপাশি নারীর অধিকারকে সমুন্নত করেছে। নারীকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। নারীর প্রাপ্য অধিকারগুলো নিশ্চিত করেছে। কখনো নারীকে, আবার কখনো পুরুষকে বেশি অধিকার দিয়ে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অধিকার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। পরস্পরকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রেখে সমাজ বিনির্মাণের সুযোগ করে দিয়েছে। কেন ইসলাম নারী-পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধান দিয়েছে, তা এখানে আলোচনা করতে চাচ্ছি না।'সংবিৎ' বইতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠকগণ সেখানে দেখে নিতে পারেন।[১৫৩] এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল দুটো :

১. জাহিলি যুগের বিধান কি ইসলাম নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে?

২. ইসলাম ব্যক্তি হিসেবে নারীকে কেমন মর্যাদা দিয়েছে?

ওপরের আলোচনায় আমরা বিষয় দুটো স্পষ্ট করেছি। সেখানে আমরা দেখিয়েছি যে, ইসলাম জাহিলি রীতিকে নয়, বরং ওহির বিধানকে বাস্তবায়ন করেছে। আর ব্যক্তি হিসেবে নারী-পুরুষকে আলাদা পরিচয় ও আলাদা অধিকার প্রদান করেছে। কখনোই একজনকে মনিব আরেকজনকে দাসী মনে করেনি। কিংবা একজনকে তুলনাহীন শ্রেষ্ঠ অপরজনকে অপদার্থ মনে করেনি। বরং দুজনকে দুজনের পরিপূরক করেছে। ঘোষণা করা হয়েছে :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴿١٨٧﴾

"তারা (নারীরা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।"[১৫৪]

---

১৫২. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : কিতাবুল ওহি, ১/৩; মুবারকপুরি, শফিউর রহমান, *আর রাহীকুল মাখতুম,* পৃষ্ঠা : ৯০

১৫৩. *সংবিৎ,* পৃষ্ঠা : ১০৫-১১৯

১৫৪. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৮৭

০৭

পবিত্র স্থান ও নারী

ড. আজাদ তার বইতে অভিযোগ করে বলেছেন যে, অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামও নাকি নারীদের পবিত্র স্থান থেকে দূরে রেখেছে। তিনি বলেন,

> *"সব পিতৃতন্ত্রই নারীকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে পবিত্র এলাকা থেকে; তারা যুদ্ধ ও ধর্মীয় অনেক বস্তু ছুঁতে পারে না, এমনকি খাদ্যও স্পর্শ করতে পারে না।"*[১৫৫]

আমরা জানি না, তিনি কীসের ভিত্তিতে এমন কথা বলেছেন। হ্যাঁ, অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে হয়তো তার কথা ঠিক। এখনো অনেক ধর্মেই নারীরা তাদের ধর্ম নির্দেশিত পবিত্র স্থানে যেতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলামকে এক করে ফেলার কোনো মানে হয় না। ইসলাম আল্লাহর প্রেরিত দ্বীন, যার সাথে অন্য কোনো ধর্মের তুলনা চলে না। ইসলাম কখনোই নারীকে পবিত্র স্থানে গমন কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করাকে নিষেধ করেনি।

❋ মাসজিদে গমন

নারীদের মাসজিদে যাতায়াত অনুমোদিত। জামাআতে সালাত আদায়, পাশাপাশি হিদায়াত ও নাসিহাত গ্রহণের জন্যে নারীরা মাসজিদে যেতে পারবে, যেমনভাবে তারা ইসলামি সম্মেলনগুলোতে নাসিহাত গ্রহণের জন্যে অংশগ্রহণ করে। নবি ﷺ বলেন,

"তোমাদের স্ত্রীলোকগণ মাসজিদে যেতে চাইলে তাদের মাসজিদে যেতে বাধা দেবে

১৫৫. হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, পৃষ্ঠা : ৩৮

না।"[১৫৬]

নবি ﷺ আরও বলেন,

> "আল্লাহর বান্দিদের আল্লাহর মাসজিদে যেতে নিষেধ করবে না।"[১৫৭]

আয়িশা ؓ বলেন,

> "নবি ﷺ ফজরের সালাত আদায় করতেন আর তাঁর সঙ্গে অনেক মুমিন মহিলা চাদর দিয়ে গা ঢেকে শরীক হতো। তারপর তাঁরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেত। আর তাঁদের কেউ চিনতে পারত না।"[১৫৮]

এসব হাদীস থেকে নারীদের পবিত্র মাসজিদে গমন অনুমোদিত। তবে তাদের জন্যে ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম। যদি ফিতনার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাদের জামাতে অংশগ্রহণ করাটা অনুচিত। কেননা, আরেকটি হাদীসে আয়িশা ؓ বলেছেন,

> "রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি এ যুগের নারীদের আচরণের অবস্থা দেখতেন, তবে তাদের বানী ইসরাঈলী নারীদের মতো মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন। ইয়াহইয়া বলেন, আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বানী ইসরাঈলী নারীদের কি মাসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছিল?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'"[১৫৯]

মোটকথা পর্দা রক্ষা করে মেয়েদের মসজিদে গমন বৈধ, তবে কেবল সালাত আদায়ের জন্য হলে ঘরে আদায়ই উত্তম; কিন্তু পূর্ববর্তী শারীআত বা অন্যান্য অনেক ধর্মে উপাসনালয়ে মেয়েদের গমন যেমন নিষিদ্ধ, ইসলামে তেমনটা মোটেই নয়।

❋ পবিত্র মক্কা–মদীনায় গমন

এই পয়েন্টটা আসলে ব্যাখ্যা করার মতো কিছুই নেই। যারা ইউটিউবে চোখ বোলান, তারা বিষয়টা সম্পর্কে অবগত আছেন। হারামাইন শরীফাইন (মক্কা ও মদীনা) এর যেকোনো ভিডিও দেখলেই ব্যাপারটা অতি সহজে অনুধাবন করা যাবে। হারামাইনের সব ভিডিওতেই নারীদের তাওয়াফ, সালাত, যিকিররত অবস্থায় দেখা যায়। পবিত্র

---

১৫৬. মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : সালাত, ২/৮৭৩
১৫৭. মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : সালাত, ২/৮৭৪
১৫৮. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আযান, ১/৮৩০
১৫৯. মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : সালাত, ২/৮৯৪

স্থান যদি নারীর জন্যে নিষিদ্ধই হতো, তবে কীভাবে তারা হারামাইন শরীফাইনে ঢুকতে পারছে? আর ব্যাপারটা তো এমন নয় যে, রাসূল ﷺ-এর যুগে নারীদের এসব পবিত্র স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, পরবর্তীকালে তাদের ঢোকার সুযোগ দেওয়া হয়। নবি ﷺ-এর যুগেও নারীরা হারামাইন শরীফাইনে ইবাদাত করত, হজে অংশ নিত, তাওয়াফ করত; আর এখনো করছে। হজ ইসলামের একটি ভিত্তি। এটি রাসূল ﷺ-এর সময়েই ফরয বিধান হিসেবে নাযিল হয়। সামর্থ্যবান নারী-পুরুষের জন্যে হজ ফরয করা হয়। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

"সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহে (বায়তুল্লাহর) হজ করা ফরয। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ সৃষ্টিকুলের মুখাপেক্ষী নন।"[১৬০]

হজ করার জন্যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ বাধ্যতামূলক। আর বায়তুল্লাহ হলো ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র স্থান। নারীদের পবিত্র স্থানে প্রবেশে যদি বাধাই থাকত, তবে হাজার বছর ধরে নারীরা বায়তুল্লার তাওয়াফ করছে কীভাবে? নারীদের পবিত্র স্থানে প্রবেশে যদি বাধাই থাকত, তবে হারামাইনে তারা সালাত আদায় করছে কীভাবে, সাফা-মারওয়া পাহাড়ে তারা সাঈ করছে কীভাবে, আরাফাতের ময়দানে তারা অবস্থান করছে কীভাবে?

আজাদ যদি কোনো হাদীসগ্রন্থের 'হজ অধায়'-টি একটু পড়ে দেখতেন, তবে হয়তো তার এমন মতিভ্রম হতো না। সব হাদীসগ্রন্থেই হজ-রত অবস্থায় নারীদের বিধানাবলি সুবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কোনো গ্রন্থেই বলা নেই যে, নারীরা হজে আসতে পারবে না। পবিত্র শহর মক্কা-মদীনায় ঢুকতে পারবে না।

❋ যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ

ইসলাম পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের অনুমতি প্রদান করেছে। অনেক মহিলা সাহাবি রাসূল ﷺ-এর যুগে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তারা অসুস্থদের সেবা করেছেন, পানি পান করিয়েছেন, আহতদের পরিচর্যা করেছেন, এমনকি

১৬০. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৯৭

সরাসরি লড়াই পর্যন্ত করেছেন। হাফসা বিনতে সিরীন ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> "একবার জনৈকা মহিলা এলেন এবং বানু খালাফের প্রাসাদে অবস্থান করলেন। আমি তার নিকট গেলে তিনি বললেন, তার ভগ্নিপতি নবি ﷺ-এর সাথে বারোটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ছয়টি যুদ্ধে স্বয়ং তার বোনও স্বামীর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। (মহিলা বলেন) আমার বোন বলেছেন, আমরা রুগ্ণদের সেবা করতাম, আহতদের সেবা করতাম।"[১৬১]

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> "উহুদের যুদ্ধে সাহাবিগণ নবি ﷺ-এর কাছে থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়লেন আমি দেখলাম। আয়িশা বিনতে আবু বকর ﵄ ও উম্মে সুলাইম ﵂ তাঁদের আঁচল এতটুকু উঠিয়ে নিয়েছেন যে, আমি তাঁদের উভয় পায়ের অলংকার দেখছিলাম। তাঁরা উভয়েই মশক পিঠে বহন করে সাহাবিগণের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। আবার ফিরে গিয়ে মশক ভর্তি করে নিয়ে এসে সাহাবিগণের মুখে পানি ঢেলে ঢেলে দিচ্ছিলেন।"[১৬২]

বিনতে মুআব্বিয ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> "আমরা নবি ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে লোকদের পানি পান করাতাম ও তাদের পরিচর্যা করতাম এবং আহত ও নিহত লোকদের মদীনায় ফেরত পাঠাতাম।"[১৬৩]

এ ছাড়া উহুদের যুদ্ধের দিন উম্মে উমারাহ ﵂ ও নুসাইবা বিনতে কা'ব ﵂ অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। উম্মে উমারাহ ﵂ রাসূল ﷺ-এর সুরক্ষার জন্যে তলোয়ার হাতে সরাসরি কুফফারদের সাথে লড়াই করেন। নুসাইবা ﵂ ইবন কামিয়াকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেন। এতে ইবন কামিয়া আহত হয়।[১৬৪]

---

১৬১. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : দু-ঈদ, ১/৯২৮

১৬২. বুখারি, অধ্যায় : জিহাদ, ৫/২৬৮২

১৬৩. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : জিহাদ, ৫/২৬৮৪; মুসলিম, *আস-সহীহ,* ৬/৪৫৩২-৪৫৩৫; আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশআস, *আস-সুনান,* ৩/২৫২৩; আলবানি, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, *সহীহ আত-তিরমিযি,* ৩/১৫৭৫

১৬৪. মুবারকপুরি, শফিউর রহমান, *আর রাহীকুল মাখতুম,* পৃষ্ঠা : ২৯৫-২৯৬

❋ খাদ্যগ্রহণের নীতি

এমন কোনো খাবার নেই, যা পুরুষরা খেতে পারবে অথচ নারীরা পারবে না। নারীদের জন্যে যেসব খাবার হালাল, পুরুষদের জন্যেও সেসব খাবার হালাল। আল্লাহ ﷻ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

"হে মানুষ, পৃথিবীর মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র, তা হতে আহার করো; আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[১৬৫]

ব্যাপারটা এমন নয় যে, পুরুষের জন্যে গরু খাওয়া হালাল আর নারীদের জন্যে শুঁটকি খাওয়া হালাল। বরং নারী-পুরুষ উভয়ের বিধান একই। নারীদের জন্যে যা খাওয়া হালাল, পুরুষদের জন্যেও তা-ই হালাল। আবার নারীদের জন্যে যা খাওয়া হারাম, পুরুষদের জন্যেও তা হারাম। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি ইসলাম জাহিলি যুগের খাবার-বৈষম্য দূর করে। জাহিলিয়াতের সময় পুরুষরা এমন কিছু খাবার গ্রহণ করত, যা নারীদের জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইসলাম এই জাহিলিয়াত দূর করে।

হুমায়ুন আজাদ যে দাবিগুলো করেছেন, তা দলিলের আলোকে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। হ্যাঁ, দুনিয়ার অন্যান্য 'তন্ত্র' মতে তার দাবি সত্য হতে পারে। কিন্তু ইসলাম কোনো তন্ত্র-মন্ত্রের ধর্ম নয়। এটা আল্লাহর নাযিলকৃত দ্বীন। আর আল্লাহর দ্বীন আমাদের এটাই বলছে, নারীদের জন্যে নিষিদ্ধ নয় পবিত্র স্থান কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র; যদি তারা কিছু শর্ত পুরো করে।

---

১৬৫. সূরা আল বাকারাহ, ২ : ১৬৮

স্ত্রী কি চুক্তিবদ্ধ দাসী?

হুমায়ুন আজাদ ইসলামের বিবাহপ্রথা নিয়ে বেশ সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ইসলামে বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর অনুমতি নেওয়া জরুরি বিষয় নয়। কদাচিৎ অনুমতির কথা যদিও বলা হয়, আদতে তা অনুমতির অভিনয়মাত্র। আজাদ বলেন,

> *"ইসলামি আইনে স্ত্রী হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ দাসী... বিয়েতে নারীর সম্মতির কথাও বলা হয় কিন্তু তা সম্মতির অভিনয়।"*[১৬৬]

ইসলামের ন্যূনতম মৌলিক জ্ঞানটুকুও আজাদ আহরণ করার চেষ্টা করেননি। যার ফলে ইসলাম যে বিয়ের ক্ষেত্রে নারীদের মতামত নেওয়াকে বাধ্যতামূলক করেছে, এই বিধানটা জানার মতো সৌভাগ্য তার হয়নি। কোনো নারী যদি পিতার পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে না করতে চায়, তো পিতার অধিকার নেই তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার।

❋ বিয়েতে নারীদের অনুমতি

বিয়ের ক্ষেত্রে নারীকে জোরজবরদস্তি করে কোনো পাত্রের কাছে সৌপর্দ করা যাবে না। নিম্নের হাদীস তারই প্রমাণ বহন করে :

> "কাসিম ﵀ থেকে বর্ণিত। জাফর ﵁-এর বংশের জনৈকা মহিলা আশঙ্কা পোষণ করল যে, তার অভিভাবকরা তার অসম্মতিতে বিয়ে দিতে যাচ্ছে। তাই সে আনসারি

১৬৬. হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, পৃষ্ঠা : ৮৫

দুজন মুরব্বি জারিয়ার দুই পুত্র আব্দুর রহমান ﷺ ও মুজাম্মি ﷺ-কে এ কথা বলে পাঠাল। তারা বললেন, তোমার ভয়ের কারণ নেই। কেননা, খানসা বিনতে খিযাম ﷺ-কে তার পিতা তার অসম্মতিতে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিয়ে বাতিল করে দেন।"[১৬৭]

বিয়েতে নারীদের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। পাত্রস্থ করার আগে অবশ্যই তার মতামত জেনে নিতে হবে। সে যদি অভিভাবকের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করতে অসম্মতি জানায়, তবে তাকে সেই পাত্রের কাছে সৌপর্দ করা যাবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন,

"পূর্ব-বিবাহিতকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি না নিয়ে এবং কুমারীকে তার সম্মতি না নিয়ে বিয়ে দেওয়া যাবে না। সাহাবিগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, তার (কুমারীর) সম্মতি কীভাবে নেওয়া যাবে?' তিনি বললেন, 'সে নীরব থাকলে।'"[১৬৮]

ওপরের হাদীসগুলোর মাধ্যমে আমরা দেখলাম, বিয়ের জন্যে নারীর মতামত নেওয়া আবশ্যক। মতামত ছাড়া কনেকে জোর করে বিয়ে দেওয়া অন্যায়। তাই আজাদ সাহেব কীসের ভিত্তিতে ওপরের মন্তব্য করেছেন, তা তিনিই ভালো জানেন। আসলে না জেনে ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরাটা তার উচিত হয়নি। ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা থাকলে হয়তো এ কথা বলার সাহস পেতেন না তিনি।

❋ চুক্তিবদ্ধ দেহদান

এখন আমরা বিয়ে সম্পর্কিত তার আরেকটি অভিযোগের দিকে দৃষ্টি দেবো। তিনি বলেন,

"পিতৃতান্ত্রিক আইনে বিয়ে হচ্ছে নারীবলি, শরীয়ায়ও তাই।... বিয়ে একটি রসকষহীন কর্কশ চুক্তি।... তাই ইসলামে বিয়ে এক অসম চুক্তি, যাতে পুরুষটি ভোগ করে চুক্তির সুবিধা আর নারীটি ভোগ করে পীড়ন।... এখানে চুক্তি করে একজনকে দেয়া হয় অশেষ অধিকার এবং আরেকজনের প্রায় সমস্ত অধিকার বাতিল হয় কিছু সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে।"[১৬৯]

---

১৬৭. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : কূটকৌশল, ১০/৬৪৯৮

১৬৮. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : বিয়ে, ৮/৪৭৬০

১৬৯. *নারী,* পৃষ্ঠা : ৮৫

বিয়ে কখনোই চুক্তিবদ্ধ দেহদান নয়। বিয়ে হচ্ছে ব্যভিচার, যিনা থেকে বিরত থাকার কার্যকরী মাধ্যম। কিন্তু কোনো পুরুষ চাইলেই বিয়ে করতে পারবে না। বিয়ের পূর্বে তাকে কিছু শর্ত পুরো করতে হবে। এ জন্যে তাকে অবশ্যই আর্থিক ও দৈহিক উভয় দিক থেকে সামর্থ্যবান হতে হবে। যার দৈহিক ও আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে, সে দ্রুত বিয়ে করবে। আর যার যোগ্যতা নেই, সে সাওম রাখবে। সাওমের মাধ্যমে যৌনকামনা দমিয়ে রাখবে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন,

"আমরা যুবক বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম; অথচ আমাদের কোনো কিছু (সম্পদ) ছিল না। এমনই অবস্থায় আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে যুব-সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনতাকে সংযমী করে। আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে। কেননা, সাওম তার যৌনতাকে দমন করবে।"[১৭০]

নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের জন্যে প্রশান্তিকর। একে অন্যের সহায়ক। আর এ জন্যেই বিয়ের মাধ্যমে পরস্পরকে পরস্পরের কাছে আসার সুযোগ করে দেওয়া হয়। কুরআনের ভাষায় :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।"[১৭১]

অন্যত্র আরও বলা হয়েছে :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ ﴿١٨٧﴾

"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।"[১৭২]

---

১৭০. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : বিয়ে, ৮/৪৬৯৬

১৭১. সূরা আর-রূম, ৩০ : ২১

১৭২. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৮৭

✸ নারীর অর্থনৈতিক লাভ

বিয়ের মাধ্যমে একদিকে যেমন নারী-পুরুষের কামনাকে প্রশমিত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তেমনই নারীকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়েই নিজেদের কামনা পূর্ণ করলেও, নারীদের জন্যে বোনাস পাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেটা হলো মোহরের টাকা, যা পুরুষের ওপর ফরয করা হয়েছে। কুরআন বলছে :

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"সুতরাং তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করো এবং ন্যায়সংগতভাবে তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও।"[১৭৩]

ইসলাম শুধু মোহরানা পর্যন্তই সমাপ্ত করে দেয়নি; বরং স্ত্রীদের অর্থনৈতিক অধিকার আরও শক্তিশালী করতে স্বামীর সম্পত্তিতেও তাকে অংশীদার করেছে। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٢﴾

"আর যদি তোমাদের স্ত্রীদের কোনো সন্তান না থাকে, তাহলে তোমরা যা রেখে গিয়েছ তাদের জন্যে তার এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে—তোমরা যা অসিয়ত করবে, সেই অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর—তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি হতে তাদের জন্যে আট ভাগের এক ভাগ।"[১৭৪]

অপরদিকে ইসলাম স্ত্রীর ওপর স্বামীর ভরণপোষণের দায়িত্ব দেয়নি, কিন্তু স্ত্রীর ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ভার স্বামীর ওপর ন্যস্ত করেছে। আর শুধু স্ত্রী নয়, পুরুষের ওপর পুরো পরিবারের দায়ভার অর্পণ করেছে। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

১৭৩. সূরা আন-নিসা, ৪ : ২৫
১৭৪. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১২

"তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা যেখানে বসবাস করো, তাদেরও সেখানে বাস করতে দিয়ো। তাদের সংকটে ফেলার জন্যে কষ্ট দিয়ো না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্যদান করে, তবে তাদের প্রাপ্য হক আদায় করবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংগতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ করো, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে।"[১৭৫]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেছেন :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ⑦

"বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দেবেন।"[১৭৬]

❋ স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ

বিয়ের পর স্বামী যাতে স্ত্রীর ওপর অবিচার না করে—তার জন্যে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। স্ত্রীর প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে ঘোষিত হয়েছে :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُو

"আর তোমরা তাদের সাথে সদাচরণ কোরো।"[১৭৭]

স্ত্রীদের প্রতি উত্তম আচরণের ব্যাপারে হাদীসে বেশি বেশি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আমর ইবন আহওয়াস আল-জুশাম্মি رضي الله عنه রাসূল ﷺ-এর বিদায় হজের ভাষণ সম্পর্কে বলেন,

"সে ভাষণে তিনি ﷺ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। এবং লোকদের ওয়াজ-নাসিহাত করার পর বললেন, 'তোমরা নারীদের প্রতি সদাচরণ কোরো।

১৭৫. সূরা আত-তালাক, ৬৫ : ৬
১৭৬. সূরা আত-তালাক, ৬৫ : ৭
১৭৭. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১৯

কেননা, তারা তোমাদের হিফাযতে রয়েছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে (বৈধ) সুযোগ-সুবিধা লাভ ছাড়া অন্য কিছুর অধিকারী নও। অবশ্য তারা যদি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তবে তোমাদের বিছানা থেকে তাদের আলাদা করে দাও। এমনকি প্রয়োজনে তাদের প্রহার কোরো, কিন্তু কঠোরভাবে নয়। (এরপর) যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্যে ভিন্ন পথ অনুসরণ কোরো না। সাবধান! তোমাদের স্ত্রীদের ওপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো—তারা তোমাদের অপছন্দীয় লোকদের দ্বারা তোমাদের বিছানা কলুষিত করবে না এবং তাদের তোমাদের বাড়িতে ঢোকার অনুমতি দেবে না। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো—তোমরা তাদের পানাহারের ব্যাপারে ভালো ব্যবস্থা করবে, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।'"[১৭৮]

মুআবিয়া ইবন হাইদাহ ﵁ একবার রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, কারও ওপর তার স্ত্রীর কী কী অধিকার রয়েছে?' জবাবে রাসূল ﷺ বললেন,

"তুমি যখন আহার করবে, তাকেও আহার করাবে। তুমি যখন (পোশাক) পরিধান করবে, তাকেও পরিধান করাবে। কখনো তার চেহারা কিংবা মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না। কখনো তাকে অশ্লীল ভাষায় গালি দেবে না এবং ঘরের ভেতর (অর্থাৎ বিছানা) ছাড়া তার থেকে আলাদা হবে না।"[১৭৯]

❋ স্ত্রীর সাথে প্রেমময় আচরণ

সমাজের চোখে অনেকেই হয়তো ভালোমানুষ সেজে বসে থাকে। কিন্তু দেখা যায়, এরাই আবার স্ত্রীদের সাথে সারাক্ষণ চোখ রাঙিয়ে কথা বলে। ইসলাম এ ধরনের মানুষকে সাবধান করে দিয়েছে। সাথে সাথে এও জানিয়ে দিয়েছে যে, যার স্ত্রী তাকে ভালো বলে আখ্যায়িত করে, সে-ই প্রকৃত ভালো। রাসূল ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সবচাইতে উত্তম, ঈমানের দৃষ্টিতে সে-ই পূর্ণাঙ্গ মুমিন। তোমাদের মধ্যে সেসব লোক উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।"[১৮০]

---

১৭৮. নাবাবি, মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনু শরাফ, *রিয়াদুস সালিহীন*, ১/২৮১; আলবানি, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, *আদাবুয যিফাক*, পৃষ্ঠা : ১৫৯-১৬০; আলবানি, *সহীহ সুনানুত তিরমিযি*, হাদীস নং : ১১৬৩

১৭৯. নাবাবি, *রিয়াদুস সালিহীন*, ১/২৮২; আলবানি, *আদাবুয যিফাক*, পৃষ্ঠা : ১৬৮

১৮০. নাবাবি, *রিয়াদুস সালিহীন*, ১/২৮৩; আলবানি, *আদাবুয যিফাক*, পৃষ্ঠা : ১৫৮; আলবানি, *সিলসিলাতুল সহীহা*, হাদীস নং : ২৮৪

ইসলাম স্ত্রীর সাথে প্রেমময় আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। স্ত্রীকে ভালোবেসে মুখে খাবার তুলে দেওয়াকেও সাদাকাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। রাসূল ﷺ বলেন,

> "তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই খরচ করো না কেন, তোমাকে অবশ্যই তার সওয়াব দেওয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।"[১৮১]

আমরা নবি ﷺ-এর জীবনীতে স্ত্রীদের প্রতি প্রেমময় আচরণের অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। নবি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে অনেক রোম্যান্টিক আচরণ করতেন। নিশিতে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। আয়িশা رضي الله عنها বলেছেন,

> "একবার আমি রাসূল ﷺ-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তখন আমি দৌড় প্রতিযোগিতায় তাঁর আগে বেড়ে (জিতে) গেলাম। তারপর যখন আমি স্থূলকায় হয়ে গেলাম, তখন পুনরায় তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম। তখন তিনি আমার আগে বেড়ে (জিতে) গেলেন। তখন তিনি বললেন, 'এটা তোমার আগের বার জেতার বদলা।'"[১৮২]

নবিজি ﷺ তাঁর স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন। আয়িশা رضي الله عنها বলেন,

> "নবি ﷺ আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি হায়েজের অবস্থায় ছিলাম।"[১৮৩]

এমনকি দুজনে মিলে একই মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। আয়িশা رضي الله عنها বলেছেন,

> "নবি ﷺ মিসওয়াক করার পর তাঁর মিসওয়াক আমাকে ধৌত করতে দিতেন। অতঃপর আমি ওই মিসওয়াক দিয়ে মিসওয়াক করে তাঁকে ফেরত দিতাম।"[১৮৪]

রাসূল ﷺ হাড়কে ওই দিক থেকেই চিবাতেন, যেদিক থেকে আয়িশা رضي الله عنها চিবাতেন। আয়িশা رضي الله عنها বলেছেন,

> "আমি ঋতুমতী অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পরে নবি ﷺ-কে অবশিষ্টটুকু

---

১৮১. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, ১/৫৪

১৮২. আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : জিহাদ, হাদীস নং : ২৫৭০

১৮৩. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ, ১/২৯৩; মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৬০০; আহমাদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ,* অধ্যায় : হায়েজ-ইস্তিহাযা ও নিফাস, ১/৩২৭-৩২৮; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* ১/৬৩৪; আবু দাউদ, *আস-সুনান,* ১/২৬০; নাসাঈ, *আস-সুনান,* ১/২৭৪

১৮৪. আবু দাউদ, *আস সুনান,* অধ্যায় : পবিত্রতা, হাদীস নং : ৫২; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : পবিত্রতা, হাদীস নং : ২৯০

> প্রদান করলে, আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম তিনিও সেই স্থানেই মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আবার আমি ঋতুমতী অবস্থায় হাড় খেয়ে তা নবি ﷺ-কে দিলে, আমি যেখানে মুখ লাগিয়েছিলাম তিনি সেখানে মুখ লাগিয়ে খেতেন।"[১৮৫]

গৃহস্থালির কাজে নবি ﷺ স্ত্রীদের সহায়তা করতেন। আয়িশা ؓ নবি ﷺ সম্পর্কে বলেন,

> "তিনি ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন (পরিবারবর্গের কাজে সহায়তা করতেন)। আর সালাতের সময় হলে সালাতের জন্য চলে যেতেন।"[১৮৬]

ইসলামে স্ত্রী দাসী নয়, জীবনসঙ্গিনী। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিচ্ছদ। একে অপরের পরিপূরক। আল্লাহ ﷻ নারী-পুরুষ সম্পর্কে বলেন :

بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

"তোমরা একে অপরের অংশ।"

এতকিছুর পরেও কেউ যখন বলে, বিয়ের মাধ্যমে ইসলাম নারীর ওপর যুলুম করেছে, তার কাছ থেকে সকল অধিকার কেড়ে নিয়েছে—তখন আমাদের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, তার অন্তরে রোগ আছে। আর শয়তান তার মাথার ওপর ভর করে বসে আছে।

---

১৮৫. মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৫৯৯; আহমাদ ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, অধ্যায় : হায়েজ-ইস্তিহাযা ও নিফাস, ১/৩২৭; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, ১/৬৩৪; আবু দাউদ, *আস-সুনান*, ১/২৫৯

১৮৬. বুখারি, *আস-সহীহ*, হাদীস নং : ৬৭৬

০৯

পর্দা কী ও কেন?

অনেক নামধারী মুসলিম ও ইসলামবিদ্বেষীরা প্রায়শই নারীদের পর্দার বিধান নিয়ে সমালোচনার ঝড় তোলেন। বক্তৃতা, বিবৃতি, আলোচনা, লেখনী ইত্যাদির মাধ্যমে তারা এটা প্রমাণ করতে চান যে—নারী প্রগতিকে যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করে দমিয়ে রাখা হয়েছে—তার মধ্যে অন্যতম হলো পর্দা। তারা বেশির ভাগ এটাকে অবরোধ বলে চালিয়ে দিতে চান। তাদের বক্তব্য শুনলে মনে হয়, উন্নতি ও প্রগতির অন্যতম অন্তরায় এই পর্দা। পর্দা নারীদের বন্দী করে রেখেছে। কেড়ে নিয়েছে অবাধ চলাফেরার অধিকার।

এখন আধুনিকতার যুগ, ফ্যাশনের যুগ, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার যুগ। এখন কেন নারীরা পর্দার মাধ্যমে অবরুদ্ধ হয়ে রবে? কেন তারা পুরুষের সাথে সহাবস্থান করতে পারবে না? কেন তারা তাদের নিজের পছন্দমতো পোশাক বাছাই করতে পারবে না? কেন তাদের বোরখা নামক মধ্যযুগীয় পোশাকে নিজেকে আবৃত করেতে হতে হবে? কেন কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের আলাদা আলাদা স্থান হবে? এটা কি ইসলামের বাড়াবাড়ি নয়?

অসংখ্য মিথ্যা আর অযৌক্তিকতার সমাহারে তৈরি এদের কথাগুলো অত্যন্ত মুখরোচক বটে! এদের কথাগুলো যতই সুন্দর, চিত্তাকর্ষক কিংবা মুখরোচক হোক না কেন, তা কেবলই অন্তঃসারশূন্য। প্রগতি কিংবা নারী অধিকার এদের কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়। এরা নারী প্রগতির নামে তাদের অসৎ উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে চায়। ড. আজাদও এই ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম করেননি। তিনিও পর্দার বিধানের বেশ জোরালো সমালোচনা করেছেন। পর্দাকে কূট প্রতিক্রিয়াশীলতা বলেছেন। বোরখাকে মধ্যযুগীয়

পোশাক বলে অভিহিত করেছেন।

> *"বোরখা জিনিশটি কুৎসিত, মধ্যযুগীয় পিতৃতন্ত্র এটি চাপিয়ে দিয়েছে নারীর ওপর।"[১৮৭]*

> *"এখন শুরু হয়েছে কূট প্রতিক্রিয়াশীলতা; আবার অদ্ভুত বোরখায় ঢেকে দেয়া হচ্ছে মুসলমান নারীর মুখমণ্ডল, এবং এভাবে চলতে থাকলে দু-এক দশকের মধ্যেই হয়তো মুসলমান নারী আবার বন্দী হয়ে পড়বে অবরোধে; বাস করবে হারেমে। মুসলমান পিতৃতন্ত্র এখন দেখা দিচ্ছে উগ্র পিতৃতন্ত্ররূপে, নারী হয়ে উঠছে তার শিকার; অনতিবিলম্বেই মুসলমান নারীকে পুরুপুরি মধ্যযুগে পাঠিয়ে দেয়া হবে, এমন আভাস চারপাশে।"[১৮৮]*

> *"বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়াশীলতার যে বিস্তার ঘটেছে, তা প্রগতির জন্যে উদ্বেগজনক এবং নারীর জন্যে বিশেষভাবেই ভীতিকর। চারপাশে এখন কালো বোরখার ভৌতিক প্রচ্ছায়া দেখা যাচ্ছে, নারীদের এখন বেরোতে হয় আগের থেকে অনেক বেশি সাবধানে, নারী এখন আগের থেকে বেশি পরিমাণে নিজের শরীর ঢেকে রাখতে বাধ্য হয়; এবং সবচেয়ে শোচনীয় হচ্ছে অনেক নারীরাও দীক্ষিত হচ্ছে মৌলবাদে।... বোরখাপরা বিবাহিত ছাত্রীরা কেউ বিয়ের আগে বোরখা পরতো না, বিয়েই তাদের তুলে দেয় মধ্যযুগের হাতে। এতে তারা সবাই পীড়িত বোধ করে, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল পরিবার টিকিয়ে রাখার জন্যে তারা বাধ্য হয় মধ্যযুগকে মেনে নিতে। কিছু মেয়ের জন্যে এটা এতো পীড়াদায়ক যে তারা আক্রান্ত হয় মানসিক রোগে। আধুনিক তরুণীর মুখের ওপর কালো বোরখা চাপিয়ে তাকে কেমন বিকৃত ক'রে দেয়া হয়, তার কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে, তার মধ্যে একটি কখনো ভুলবো না।"[১৮৯]*

❋ পর্দা শব্দটা ব্যাপক অর্থ বহন করে

আজাদের মতো লোকেরা অযথাই পর্দা নিয়ে, বোরখা নিয়ে হইচই করেন। কারণ, তারা জানেনও না, পর্দা বলতে কী বোঝায়? পর্দা বলতে কেবল বোরখা-জাতীয় পোশাক বোঝায় না, এর আরও বিভিন্ন দিক রয়েছে। ইসলামে পর্দা শব্দটা ব্যাপক অর্থ বহন করে। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ﷺ বলেন,

১৮৭. হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, পৃষ্ঠা : ২৯৬
১৮৮. *নারী*, পৃষ্ঠা : ৩১২
১৮৯. *নারী*, পৃষ্ঠা : ৩৬৮

"ইসলামে পর্দা বলতে কী বুঝায় এবং পর্দার গুরুত্ব কী, তা অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। পর্দা বলতে অনেকেই অবরোধ বুঝেন। তারা ভাবেন যে, পর্দা করার অর্থ মুসলিম মহিলা নিজেকে গৃহের মধ্যে আটকে রাখবেন। কোনো প্রয়োজনে তিনি বাইরে বেরোতে পারবেন না। পরিবারের বা সমাজের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে, পর্দা নিজের কাছে বা নিজের মনে। পর্দার জন্য বিশেষ কোনো বিধান বা বিশেষ কোনো পোশাক নেই। এ বিষয়ে আলিম বা প্রচারকদের মতামতকে তারা ধর্মান্ধতা বা বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন। কেউ বা মনে করেন যে, পর্দা করা ভালো, তবে বেপর্দা চলাফেরা পাপ বা অপরাধ নয়। বা কঠিন কোনো অপরাধ নয়।

পর্দা ফার্সি শব্দ। আরবি 'হিজাব' শব্দের অনুবাদে ফার্সি পর্দা শব্দটিই বাংলায় প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। হিজাব অর্থ আড়াল বা আবরণ। ইসলামি পরিভাষায় হিজাব অর্থ শুধু পোশাকের আবরণই নয়, বরং সামগ্রিক একটি সমাজ ব্যবস্থা, যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে অপবিত্র ও অবৈধ সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারী আচরণ রোধের বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে।... কুরআন ও হাদীসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, পর্দা ইসলামে ব্যাপক অর্থ বহন করে। পবিত্র সামাজিক পরিবেশে সুন্দর আন্তরিক স্নেহ-মমতা-ভালোবাসাপূর্ণ পরিবার গঠনে ইসলামের বিভিন্ন বিধানাবলির সমষ্টিকেই মূলত এককথায় 'পর্দা-ব্যবস্থা' বলা হয়।... এর বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন :

☞ সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটতে পারে এরূপ সকল কথা বা কর্ম থেকে বিরত থাকা।

☞ অশ্লীলতার প্রচার বা প্রসারমূলক কাজে লিপ্তদেরকে শাস্তি প্রদান করা।

☞ সন্তানদেরকে পবিত্রতা ও সততার ওপর প্রতিপালন করা এবং অশ্লীলতার প্ররোচক বা অহেতুক সুড়সুড়িমূলক সকল কথা বা দৃশ্য থেকে তাদেরকে দূরে রাখা।

☞ কারও আবাসগৃহে বা বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের ব্যবস্থা এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা।

☞ নারী ও পুরুষের শালীন পোশাক পরিধান করা।

☞ নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা।

☞ সঠিক সময়ে প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়া। বিধবা ও বিপত্নীক

ব্যক্তিদের প্রয়োজনে বিবাহের উৎসাহ দেওয়া।

☞ দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা বজায় রাখা।"[১৯০]

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পর্দার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও আলোচনাসাপেক্ষ। ক্ষুদ্র পরিসরে তা আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। তাই ইসলাম কেন পর্দা ফরয করেছে, তার যৌক্তিক জবাব নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করব। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

❋ ইসলাম কেন পর্দাকে ফরয করেছে?

ইসলাম কেন পর্দাকে ফরয করেছে, এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা উন্নত বিশ্ব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করে নেব। কেননা, আমাদের আলোচনা এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্কযুক্ত। নারী-পুরুষ যে সকল ক্ষেত্রেই সমান, এই ধারণা পশ্চিমাদের থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে। তাদের মতে—নারী শুধু নৈতিক মর্যাদা ও অধিকারের দিক থেকেই পুরুষের সমান নয়; বরং পুরুষ যে ধরনের কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করবে নারীরাও অনুরূপ কাজ করবে, নৈতিক বন্ধন পুরুষের জন্যে যেমন শিথিলযোগ্য হবে, তেমনি নারীর জন্যেও শিথিলযোগ্য হবে। ওদের সাম্যের এই ধারণা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তা মানুষকে গিলিয়ে খাওয়ানো হলো। ধীরে ধীরে নারীরা এই ফাঁদে আটকে গেল। যার ফলে অবাধ মেলামেশার নামে এক পাশবিক ব্যবস্থার সূচনা হলো। নৈতিকতাকে দূরে ঠেলে ক্রমান্বয়ে ওরা তথাকথিত প্রগতির দিকে এগোতে লাগল। প্রগতির ধাক্কায় নারীরা তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পর্কে উদাসীন ও বিদ্রোহী করে তুলল। আস্তে আস্তে পুরুষের চোখেও যা লজ্জাজনক বলে গণ্য হতো, নারীদের চোখে তা স্বাভাবিক হয়ে গেল। মধ্যে অবাধ মেলামেশা এতটাই লাগামহীন হয়ে গেল যে, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ছায়াছবি, বিনোদন ইত্যাদি সবকিছুতেই যৌনতা ও অশ্লীলতা মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। অশ্লীলতা, ব্যভিচার, অযাচার, যৌনবাহিত রোগ, ভ্রূণ হত্যা, ধর্ষণ, সমকামিতা ইত্যাদি নিত্যসঙ্গীতে পরিণত হলো।

❋ ধর্ষণ ও উন্নত বিশ্ব

উন্নত বিশ্ব বলতেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইডেন,

১৯০. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা*, পৃষ্ঠা : ২৪৫-২৪৬; *ইসলামে পর্দা*, পৃষ্ঠা : ৫

ডেনমার্ক, জাপান এইসব দেশের নাম। এছাড়া প্রভাবশালী দেশের তালিকায় আছে চীন ও ভারতের মতো অর্থনৈতিক পরাশক্তি। এদের টেকনোলজিক্যাল উন্নতি ও জাঁকজমক দেখে আমরা প্রায়ই তাদের নৈতিক স্খলনের কথা ভুলে যাই। মনে করি এসব দেশে কোনও অপরাধ নেই। হ্যাঁ, একথা সত্য যে তাদের সামাজিক ন্যায়বিচার বেশিরভাগ দেশের চেয়ে ভালো এবং দুর্নীতি অনেক কম। কিন্তু যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে যে দরিদ্র দেশগুলোর চেয়ে তারা কম যায় না, বরং অনেকক্ষেত্রে এগিয়েই, সেটা আমরা পরিসংখ্যান থেকে দেখতে পারি। কাজেই নারী নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদেরকে মডেল ভাবার আগে চলুন আমরা তথ্য-উপাত্তে একবার চোখ বুলিয়ে নিই।

▪ যুক্তরাষ্ট্র :

উন্নত বিশ্ব বললেই অনেকের মাথায় যুক্তরাষ্ট্র শব্দটি চলে আসে। যদিও এই রাষ্ট্রটি উন্নত বিশ্বগুলোর মধ্যে প্রথম নয়, তবুও পরাশক্তিগত দিক থেকে এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। প্রথমেই এই দেশের ধর্ষণের চিত্রটা আমরা উপস্থাপন করব। ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ২,১৬,৬০০টি যৌন অপরাধ সংঘটিত হয়, যার মধ্যে ৬৯,৮০০টিই ধর্ষণ। এদের মধ্যে ধর্ষিত নারীদের সংখ্যা ৯১% আর পুরুষদের সংখ্যা ৯%।[১৯১] National Violence Against Women Survey অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৬ জনে ১ জন নারী ও ৩৩ জনে ১ জন পুরুষ যৌন হেনস্থার শিকার হয়। প্রতিবছর ৮০ হাজার আমেরিকান শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়। কিন্তু অপ্রকাশিত সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি।[১৯২] National Institute of Justice পরিচালিত ২০০৭ সালে এর একটি অনুসন্ধানে দেখা যায়, কলেজ-পড়ুয়া নারীদের ধর্ষিত হওয়ার হার ১৯.০%।[১৯৩] এফ.বি.আই-এর দেওয়া আরেকটি তথ্য থেকে জানা যায়, ২০১২ সালে ৬৭,৩৪৫

---

১৯১. "United States Department of Justice Initial Regulatory Impact Analysis for Notice of Proposed Rulemaking Proposed National Stand" (PDF). http://ojp.gov/programs/pdfs/prea_nprm_iria.pdf

১৯২. American Academy of Child & Adollescent Psychiatry, "Child Sexual Abuse". Aacap. org. 2013-08-20. Retrieved 2013-12-04.

১৯৩. Patricia Tjaden and Nancy Thoennes, "Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women: Findings of the National Violence Against Women Survey"(PDF). https://www.ncjrs.gov/pdffiles/172837.pdf

National Institute of Justice. November 1998. Retrieved 2014-02-01. Krebs, Christopher P.; Lindquist, Christine H.; Warner, Tara D.; Fisher, Bonnie S.; Martin, Sandra L. (December 2007).

"The Campus Sexual Assault (CSA) Study" (PDF). National Institute of Justice. https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/221153.pdf

জন নারী ও ১২,১০০ জন পুরুষ যৌন হেনস্থার শিকার হয়।[১৯৪]

এগুলো পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট হওয়া ধর্ষণের সংখ্যা। অপ্রকাশিত সংখ্যাটা নিছক সামান্য নয়। এমন অনেক নারী রয়েছে, যারা তাদের সাথে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কথা জনসম্মুখে প্রকাশ করেন না। ফলে একটি বিরাট সংখ্যা অপ্রকাশিতই থেকে যায়। প্রায় ৯৫% কলেজ-শিক্ষার্থী তাদের সাথে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা গোপন রাখে।[১৯৫] একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মোট ধর্ষণের ৫৯%-ই রিপোর্ট করা হয় না।[১৯৬] যতগুলো ধর্ষণ সংঘটিত হয়, তার মধ্যে মাত্র ১৬% পুলিশ স্টেশনে নথিভুক্ত করা হয়। নথিভুক্ত অপরাধীর মধ্যে মাত্র ২৫% গ্রেপ্তার হয়। এদের মধ্যে আবার ৫% ধর্ষক মাত্র এক দিন জেল খেটে বেরিয়ে যায়।[১৯৭]

- **যুক্তরাজ্য :**

ইউরোপে নারীরা প্রতিবছর মারাত্মক সহিংসতার শিকার হয়। British Crime Survey-এর ২০১৫ সালের অপরাধ-বিষয়ক একটি অনুসন্ধানে জানা যায়, জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ৩৪ হাজার নারী ধর্ষিত হয়। ইংল্যান্ডে প্রতিবছর ৮৫ হাজার নারী এবং ১২ হাজার পুরুষ ধর্ষিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাত্র ১৫% ভিকটিম পুলিশের কাছে রিপোর্ট করে।[১৯৮] NCPCC-এর একটি রিপোর্ট

---

১৯৪. "Victims sex by offense category"."Offenders sex by offense category" FBI. Federal Bureau of Investigation. 2012.

১৯৫. Fisher, Bonnie S.; Cullen, Francis T.; Turner, Michael G. (December 2000). "Sexual Victimization of College Women" (PDF).
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/182369.pdf National Institute of Justice. p. 24. Retrieved April 2013

১৯৬. Andrea Parrot; Nina Cummings (2006). Forsaken females: the global brutalization of women. Rowman & Littlefield. pp. 43. ISBN 978-0-7425-4579-3. Retrieved 1 October 2011.
https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/nibrs/2012/table-pdfs/victims-sex-by-offense-category-2012
"Crime & Punishment '98 .pm2" (PDF). Retrieved 2010-12-31.Abbey, A., BeShears, R., Clinton-Sherrod, A. M., & McAuslan
http://www.ncpa.org/pdfs/st229.pdf

১৯৭. "Crime & Punishment '98 .pm2" (PDF). Retrieved 2010-12-31.Abbey, A., BeShears, R., Clinton-Sherrod, A. M., & McAuslan
http://www.ncpa.org/pdfs/st229.pdf

১৯৮. "Crime in England and Wales: Year ending December 2015 - Sexual offenses". Office for National Statistics. December 2015. Retrieved May 2016
http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/crimeinenglandandwales/yearendingdecember2015#sexual-offences

অনুসারে, প্রতি ২০ জনে ১ জন শিশু যৌন অপব্যবহারের খপ্পরে পরে।[১৯৯]

Dr. Purna Sen (যিনি Lndon School of Economics-তে কর্মরত) এবং Prof. Liz Kelly (যিনি London Metropolitan University-তে কর্মরত)-এর সম্মিলিত একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে। যার নাম ছিল Violence Against Women in the UK. তাদের রিপোর্ট হতে জানা যায়, ২০০১-২০০৪ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্য প্রায় লাখ খানেক নারী ধর্ষিত হয়। যার ২৩%-ই ঘটে ২০০৪ সালে।[২০০] সম্প্রতি (১৮ অক্টোবর ২০১৬, মঙ্গলবার) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত আসামী ছিল স্যাম আর্মস্ট্রং। সে দক্ষিণ থানেটের এমপি ক্রেগ ম্যাকিনলির সহযোগী। স্যাম আর্মস্ট্রংকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যায় স্যাম। ঘটনার সত্যতা মেনে নেয় তৎকালীন পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ 'হাউস অব কমনস'। তদন্তে পুলিশকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তারা।[২০১]

- **ভারত :**

ভারতে ধর্ষণ এবং যৌন অপরাধ মাত্রাতিরিক্ত বেশি। দিল্লীকে বলা হয় ধর্ষণের রাজধানী। ভারতের বহুল প্রচারিত দৈনিক The Times of India-এর একটি রিপোর্ট অনুসারে, ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩০০টি ধর্ষণ সংঘটিত হয়।[২০২] The National Crime Records Bureau of India অনুসারে, ধর্ষিতা নারীর ১,০০,০০০ জনের মধ্যে মাত্র ২ জনের খবর মিডিয়ায় প্রকাশ পায়। তাহলে অপ্রকাশিত সংখ্যাটা কত, তা আল্লাহই ভালো জানেন। National Crime Records Bureau-এর বাৎসরিক রিপোর্ট অনুসারে, শুধু ২০১৩ সালে

---

১৯৯. NSPCC. "Sexual abuse". NSPCC. Retrieved 2016-05-24. https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/child-sexual-abuse/

২০০. Dr. Purna Sen, Prof. Liz Kelly, Violence Against Women in the UK, 2007, p.16 https://www.google.com.bd/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=women+vilolence+in+uk+pdf

২০১. http://m.dailynayadiganta.com/detail/news/162362

২০২. "300 rapes and 500 molestation cases reported in just 2 months".Times of India. Times of India. Retrieved 3 June 2016 http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/300-rapes-and-500-molestation-cases-reported-in-just-2-months/articleshow/46488674.cms

২৪,৯২৩টি ধর্ষণ হয়।[২০৩]

Times of India-এর একটি রিপোর্ট অনুসারে, ভারতে প্রতিদিন অন্তত ৯৩ জন মহিলা ধর্ষিত হয়।[২০৪] লোকসভায় দেওয়া মানিকা গান্ধীর তথ্যানুসারে, ভারতে ২০১৪ সালে ১৩,৭৬৬ জন শিশু ধর্ষিত হয়।[২০৫] Human Rights Watch-এর একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ১,০০,০০০ জন অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রায় ৭,২০০ জনই ধর্ষিত হয়।[২০৬] The Government of Odisha-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, ভারতে নারীদের ওপর ঘটে যাওয়া সহিংসতার মাত্র ৪০% লিপিবদ্ধ করা হয়, বাকি ৬০%-ই গোপন থাকে।[২০৭]

- **চীন :**

US Department of State-এর রিপোর্ট অনুসারে, শুধু ২০০৭ সালে চীনে ৩১,৮৩৩টি ধর্ষণ সংঘটিত হয়।[২০৮] Maplecroft-এর একটি অনুসন্ধানে দেখা যায়, অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিরুদ্ধে অপরাধ ও পাচারের মাধ্যমে সংঘটিত যৌন হয়রানির তালিকায় চীন ১ নম্বরে অবস্থান করছে। এ তালিকায় ভারত ৭ম, রাশিয়া ১১তম এবং ইন্দোনেশিয়া ১৪তম।[২০৯]

---

২০৩. National Crimes Record Bureau, Crime in India 2012 - Statistics Government of India (May 2013)
http://ncrb.nic.in/CD-CII2012/Statistics2012.pdf

২০৪. "93 women are being raped in India every day, NCRB data show". Times of India. Times of India. Retrieved 3 June 2016.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/93-women-are-being-raped-in-India-every-day-NCRB-data-show/articleshow/37566815.cms

২০৫. "13,766 cases of child rapes reported in 2014". India Today. India Today. Retrieved 4 June 2016.
http://indiatoday.intoday.in/story/child-rapes-shoot-up-in-three years/1/457104.html

২০৬. Geeta Pandey (2013-02-07). "BBC News - India child sex victims 'humiliated' - Human Rights Watch". Bbc.co.uk. Retrieved2013-03-15
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-21352102

২০৭. Odisha Review Govt of Odisha, Page 59 (June 2013)
http://orissa.gov.in/e-magazine/Orissareview/2013/jun/engpdf/59-63.pdf

২০৮. "Rape in China, University of Southern California". Uschina.usc.edu. May 7, 2009. Retrieved 2013-12-03.
http://www.uschina.usc.edu/w_usci/showarticle.aspx?articleID=13037&AspxAutoDetectCookieSupport=1

২০৯. Alyson Warhurst; Cressie Strachan; Zahed Yousuf; Siobhan Tuohy-Smith (August 2011). "Trafficking A global phenomenon with an exploration of India through maps" (PDF). Maplecroft. pp. 39–45. Retrieved 25 December 2012.
http://maplecroft.com/about/news/trafficking_report.html

The University of Hong Kong-এর একটি রিপোর্ট হতে জানা যায়, হংকং-এ ১০,০০০ জনের মধ্যে ৭,০০০ জন নারীই যৌন হয়রানির শিকার হয়। প্রতিদিন অন্তত ২০-২৭টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। The University of Hong Kong ৮০৬ জন শিশুর ওপর একটি জরিপ চালায়। তারা দেখতে পায়, এই ৮০৬ জনের মধ্যে ২৩৩ জন শিশুই কোনো না কোনো সময় যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে।[২১০]

- **ডেনমার্ক :**

UNODC-এর একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, ডেনমার্কে বাৎসরিক শুধু পুলিশের কাছে যেসব ধর্ষণের রিপোর্ট জমা হয়, তার পরিমাণ প্রায় ৫০০।[২১১]

- **সুইডেন :**

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)-এর ২০১২ সালে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায়, প্রতি ১,০০,০০০ জন সুইডিশের মধ্যে ৬৬ জন ধর্ষণের শিকার হয়।[২১২]

❋ যৌনরোগের মহামারি

যৌনতা একটি সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধির বিস্তার তখনই মহামারি আকার ধারণ করে, যখন অশ্লীলতা, ব্যভিচার, নগ্নতার মাত্রাতিরিক্ত ছড়াছড়ি হয়। আজ পাশ্চাত্যের সমাজগুলোতে অশ্লীলতার পর্যাপ্ত ছড়াছড়ি ঘঠছে। এই অশ্লীলতা থেকে বাদ যায়নি তাদের শিক্ষাব্যবস্থাও। তাদের কিশোর-কিশোরীরা তো বটেই, শিশুরাও যৌনতার থাবা থেকে বাদ যায়নি। অবস্থা এমন হয়েছে যে, যারা উভকামিতার (Bisexuality) সুযোগ পেয়েছে তারা তো তার সদ্ব্যবহার করেছেই; কিন্তু যারা তা হতে বঞ্চিত হয়েছে, তারা সমকামিতার (Homosexuality) সুযোগ নিয়েছে। ফলে তাদের দেশে যৌনবাহিত রোগ (Sexually Transmitted Disease) এতটা মহামারি আকার ধারণ করেছে যে, তা আয়ত্তে আনতে স্বাস্থ্যবিভাগ প্রতিনিয়ত হিমশিম খাচ্ছে।

---

২১০. Chan, Ko Ling, Ph.D., Sexual Violence Women & Children in China, P.20

২১১. "Voldtægt" (in Danish). Danish Crime Prevention Council. Retrieved13 October 2014 http://www.dkr.dk/voldt%C3%A6gt-0

২১২. "Rape at the national level, number of police-recorded offences".UNODC. 2013. Retrieved 10 June 2014.
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/CTS2013_SexualViolence.xls

■ **এইডস :**

যৌনবাহিত রোগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটির মহামারি দেখা যাচ্ছে, তার নাম HIV/AIDS। এইডস তাদের অন্যতম প্রধান যৌনসমস্যা। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই ১.২ মিলিয়ন লোক এইচআইভিতে আক্রান্ত। যার ফলাফল হলো ১৭,৫০০টি মৃত্যু। ২০০৯ সালে যুক্তরাজ্যে ৮৬,৫০০ জন এইডসে আক্রান্ত হয় এবং ৫১৬ জনের মৃত্যু ঘটে। কানাডায় ২০০৮ সালে ৬৫,০০০ জন এইডসে আক্রান্ত হয় এবং মারা যায় ৫৩ জন।[২১৩]

CDC (Centers for Disease Control)-এর রিপোর্ট হতে জানা যায়, ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ১২,১৮,৪০০ জন এইডস আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায়। যাদের মধ্যে ১,৫৬,৩০০ জনই তাদের সংক্রমণ সম্পর্কে অসচেতন। আর যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর প্রায় ৫০ হাজার জন নতুন করে এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে।[২১৪] শুধু ২০১২ সালে ১৩,৭১২ জন এইডস রোগীর মৃত্যু ঘটে। সামগ্রিকভাবে ৬,৫৮,৫০৭টি মৃত্যুর কারণ এইডস। UNAIDS-এর ২০০৯ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে ১২ লক্ষ লোক HIV নিয়ে বসবাস করছে। তাদের মধ্যে ৩,১০,০০০ জনই নারী, যাদের বয়স ১৫+।[২১৫] New York-এ ১,১৯,৯২৯ জন লোক HIV ভাইরাস নিয়ে বসবাস করছে। শুধু New York City-তে যার সংখ্যা ৯২,৬৬৯ জন। Washington DC-তে সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি।[২১৬]

এইডসের কারণে ক্যালিফোর্নিয়াতে ৮৫,৯৮৫ জন, লস এঞ্জেলসে ৩১,৯৭৬ জন, সান ফ্রান্সিসকোতে ১৮,৮৩৮ জন এবং সান ডিয়াগোতে ৭,১৩৫ জনের মৃত্যু ঘটে।[২১৭] যুক্তরাষ্ট্রে মোট সংক্রমণের ৫৭%-ই সমকামীদের দ্বারা ছড়ায়। Center for Disease

২১৩. Centers for Disease Control and Prevention, (CDC) (June 3, 2011). "HIV surveillance—United States, 1981–2008

২১৪. "HIV in the United States". Center for Disease Control. September 29, 2015. Retrieved June 29, 2016

২১৫. United States". HIV/AIDS Knowledge Base. University of California, San Francisco. Retrieved November 25, 2011.

২১৬. "December 2008 Monthly HIV/AIDS Statistics" (PDF). California Department of Public Health Office of AIDS. July 9, 2009. Retrieved March 21, 2010.
"The HIV/AIDS Epidemic in the United States". Kaiser Family Foundation. March 22, 2013. Retrieved June 2, 2012.

২১৭. "December 2008 Monthly HIV/AIDS Statistics" (PDF). California Department of Public Health Office of AIDS. July 9, 2009. Retrieved March 21, 2010. "The HIV/AIDS Epidemic in the United States". Kaiser Family Foundation. March 22, 2013. Retrieved June 2, 2012.

Control-এর পরিসংখ্যান হতে জানা যায়, পুরুষ সমকামীদের ৪৪%-ই নিজেদের আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে অসচেতন।[২১৮]

■ গনোরিয়া :

গনোরিয়া (gonorrhea) যৌনবাহিত রোগ। World Health Organization-এর দেওয়া রিপোর্ট হতে জানা যায়, বিশ্বে প্রতিবছর ৪৪৮ মিলিয়ন লোক গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয়।[২১৯] ২০১৩ সালে ইংল্যান্ড হতে পরিচালিত একটি রিপোর্ট বলছে, গনোরিয়ার কারণে ইংল্যান্ডে ৩,২০০ জন লোকের মৃত্যু ঘটে।[২২০] ২০১৩ সালে CDC (Center for Disease Control) অনুমান করে যে, যুক্তরাজ্যে ৮,২০,০০০ জনেরও বেশি লোক গনোরিয়ার প্রভাবের শিকার। CDC-এর ২০০৪ এর একটি রিপোর্ট হতে জানা যায়, প্রতি ১,০০,০০০ জনের মধ্যে ১১৩.৫ জন লোক গনোরিয়াজনিত প্রভাবের শিকার।[২২১] CDC পরিচালিত আরেকটি রিপোর্ট হতে জানা যায়, আফ্রিকান-আমেরিকানরাই বেশি গনোরিয়াতে আক্রান্ত হয়। গনোরিয়াজনিত রোগের মধ্যে ৬৯%-ই তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়।[২২২]

■ সিফিলিস :

এর পরেই যে রোগের ছড়াছড়ি তার নাম সিফিলিস (syphilis)। ১৯৯৯ সালে বিশ্বে ১২ হাজার মিলিয়ন সিফিলিস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়। ২০১০ সালে সিফিলিসের কারণে ১,১৩,০০০টি মৃত্যু সংঘটিত হয়। সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলের মৃত্যুর ২০% কারণ এই সিফিলিস। মাদকাসক্ত এবং সমকামী যুবকদের

---

২১৮. "Estimating HIV Prevalence and Risk Behaviors of Transgender Persons in the United States: A Systematic Review". AIDS Behav. 12 (1): 1–17. Jan 2008. doi:10.1007/s10461-007-9299-3. PMID 17694429.

২১৯. Emergence of multi-drug resistant Neisseria gonorrhoeae (Report). World Health Organisation. 2012. p. 2. Archived from the original (pdf) on 2014-09-12.

২২০. GBD 2013 Mortality and Causes of Death, Collaborators (10 January 2015). "Global, regional, and national agesex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.". Lancet (London, England). 385 (9963): 117–71. PMID 25530442.

২২১. "Gonorrhea–CDC Fact Sheet". CDC. 29 May 2012. Retrieved 2013-12-20.

২২২. "STD Trends in the United States : 2010 National Data for Gonorrhea, Chlamydia, and Syphilis". Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 22 November 2010.

সিফিলিস আক্রান্ত হবার আশঙ্কা বেশি।[২২৩] ২০১৪ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সিফিলিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। ১৮ এবং ১৯ শতাব্দীতে ইউরোপে এই রোগটি খুব সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২০০০ সাল হতে উন্নত বিশ্ব যেমন : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশে সিফিলিস ক্রমাগত বেড়েই চলছে। সম্প্রতি আমেরিকান নারীদের মধ্যে এর সংক্রমণের মাত্রা স্থিতিশীল থাকলেও ইউরোপের নারীদের মধ্যে তা বাড়ছে।[২২৪]

❋ ভ্রূণ হত্যা, গর্ভপাত, সর্বোপরি জন্মহার হ্রাস

সেই বিংশ শতাব্দী থেকেই তাদের মাঝে ভ্রূণ হত্যা এবং শিশু হত্যা বিস্তার লাভ করেছে। তাদের দেশের দায়িত্বশীলগণও এই ধরনের অপরাধকে উপেক্ষা করে আসছে। আমেরিকায় প্রতিবছর ৬৫২, ৬৩৯টির বেশি গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে।[২২৫] যুক্তরাজ্যে প্রতিবছর দুলাখের মতো গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে।[২২৬] সম্প্রতি পোল্যান্ডে সরকার আইন করেছিল গর্ভপাত নিষিদ্ধ করার। যার ফলে সে দেশের নারীরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। গত ৩/১০/২০১৬ তারিখে নারীরা এই আইনের প্রতিবাদস্বরূপ রাজধানী ওয়ারশ-এ কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করে। তারা এই দিনিটির নাম প্রদান করে 'ব্ল্যাক মানডে' (Black Monday)। সেদিন নারীরা সমগ্র রাজধানীজুড়েই ধর্মঘট পালন করে। পোল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

পোল্যান্ডে গর্ভপাত পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব এসেছিল Stop Abortion নামে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হতে। আইনটি পাশ হলে যেসব নারী গর্ভপাত করেছে বলে প্রমাণিত হবে, আদালত তাদের পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিতে পারবে।

---

২২৩. "Trends in Reportable Sexually Transmitted Diseases in the United States, 2007". Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 13 January 2009. Retrieved 2 August, 2011.

২২৪. Kent, ME; Romanelli, F (February 2008). "Reexamining syphilis: an update on epidemiology, clinical manifestations, and management". Annals of Pharmacotherapy. 42 (2): 226–36. Doi: 10.1345/aph.1K086. PMID 18212261.

২২৫. "Abortion Surveillance—United States, 2014, Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved 11 December 2016.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/ss/ss6624a1.htm

২২৬. Nakatudde, Nambassa (6 October 2014). S tatistics on Abortion (Commons Briefing papers SN04418

(http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN04418.) House of Commons Library http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN04418.pdf

যেসব চিকিৎসক এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে, তাদেরও আইনের আওতায় আনা যাবে। তাই পোল্যান্ডের নারীরা গর্ভপাতের অধিকার বলবৎ রাখতে এ দিন সমগ্র পোল্যান্ডজুড়েই বিক্ষোভ সমাবেশ ও রাজধানী ওয়ারশ-এ কর্মবিরতি পালন করে।[২২৭]

উন্নত দেশের নারীরা এখন আর সন্তান ধারণ করতে চায় না। তারা ভাবে—এতে যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ের অপচয় ঘটবে। যার ফলে কোনো কোনো দেশে জন্মহার শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে। আবার কোনো কোনো দেশে শূন্যের নিচে নেমেছে। তাদের জনসংখ্যা ও ভবিষ্যৎ হুমকির সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা হ্রাসের ফলে তাদের প্রশাসন চিন্তিত। তারা জনগণকে সন্তান গ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে পুরস্কার ঘোষণা করছে। কিন্তু যৌনতার লাগামহীন যে পাগলা ঘোড়া তাদের দেশে দৌড়াচ্ছে, তাকে না থামিয়ে কেবল পুরস্কার ঘোষণা করে জনসংখ্যার ঘাটতি কমানোর চেষ্টা—অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুই নয়।

২০১৫-২০১৬ সালে বিশ্বের দেশগুলোর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কেমন ছিল, তা নিয়ে জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। এই পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ১ জুলাই ২০১৫ থেকে ১ জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত উন্নত বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিতান্তই সামান্য। এমনকি কিছু কিছু দেশে জন্মহার শূন্যের নিচে নেমে গেছে।

জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে অবস্থান	দেশ	২০১৬ সালের জনসংখ্যা	২০১৫ সালের জনসংখ্যা	পরিবর্তনের হার (%)
১	চীন	১,৪০২,৬৬৩,২৭৫	১,৩৮৯,৪৭২,০৯৯	+১.১
২	ভারত	১,৩৮২,৩২৩,৩৩২	১,৩৭৬,০৪৮,৯৪৩	+০.৫
৩	যুক্তরাষ্ট্র	৩২৪,১১৮,৭৮৭	৩২১,৭৭৩,৬৩১	+০.৭
৯	রাশিয়া	১৪৩,৪৩৯,৮৩২	১৪৩,৪৫৬,৯১৮	০.০
১১	জাপান	১২৬,৩২৩,৭১৫	১২৬,৫৭৩,৪৮১	-০.২
১৪	ভিয়েতনাম	৯৪,৪৪৪,২০০	৯৩,৪৪৭,৬০১	+১.১
১৬	জার্মানি	৮০,৬৮২,৩৫১	৮০,৬৮৮,৫৪৫	০.০

২২৭. বিবিসি : সোমবার, ৩/১০/২০১৬

২১	যুক্তরাজ্য	৬৫,১১১,১৪৩	১৪,৭১৫,৮১০	+০.৬
২২	ফ্রান্স	৬৪,৬৬৮,১২৯	৬৪,৩৯৫,৩৪৫	+০.৪
২৩	ইতালি	৫৯,৮০১,০০৪	৫৯,৭৯৭,৬৫৮	০.০
৩০	স্পেন	৪৬,০৬৪,৬০৪	৪৬,১২১,৬৯৯	-০.১
৩১	ইউক্রেন	৪৪,৬২৪,৩৭৩	৪৪,৮২৩,৭৬৫	-০.৪
৩২	আর্জেন্টিনা	৪৩,৮৪৭,২৭৭	৪৩,৪১৬,৭৫৫	+১.০
৩৬	পোল্যান্ড	৩৮,৫৯৩,১৬১	৩৮,৬১১,৭৯৪	০.০
৩৮	কানাডা	৩৬,২৮৬,৩৭৮	৩৫,৯৩৯,৯২৭	+১.০
৫১	উত্তর কোরিয়া	২৫,২৮১,৩২৭	২৫,১৫৫,৩১৭	+০.৫
৫৩	অস্ট্রেলিয়া	২৪,৩০৯,৩৩০	২৩,৯৬৮,৯৭৩	+১.৪
৫৫	তাইওয়ান	২৩,৩৯৫,৬০০	২৩,৩৮১,০৩৮	+০.১
৫৯	রোমানিয়া	১৯,৩৭২,৭৩৪	১৯,৫১১,৩২৪	-০.৭
৬৩	চিলি	১৮,১৩১,৮৫০	১৭,৯৪৮,১৪১	+১.০
৬৬	নেদারল্যান্ডস	১৬,৯৭৯,৭২৯	১৬,৯২৪,৯২৯	+০.৩
৬৯	ইকুয়েডর	১৬,৩৮৫,৪৫০	১৬,১৪৪.৩৬৩	+১.৫
৭৮	কুবা	১১,৩৯২,৮৮৯	১১,৩৮৯,৫৬২	০.০
৮০	বেলজিয়াম	১১,৩৭১,৯২৮	১১,২৯৯,১৯২	+০.৬
৮৩	গ্রিস	১০,৯১৯,৪৫৯	১০,৯৫৪,৬১৭	-০.৩
৮৪	বলিভিয়া	১০,৮৮৮,৪০২	১০,৭২৪,৭০৫	+১.৫
৮৭	চেক প্রজাতন্ত্র	১০,৫৪৮,০৫৮	১০,৫৪৩,১৮৬	০.০
৯০	সুইডেন	৯,৮৫১,৮৫২	৯,৭৭৯,৪২৬	+০.৭
৯১	হাঙ্গেরি	৯৮,৮২১,৩১৬	৯,৮৫৫,০২৩	০.৩
৯২	বেলারুশ	৯,৪৮১,৫২১	৯,৪৯৫,৮২৬	-০.২
৯৪	সার্বিয়া	৮,৮১২,৭০৫	৮,৮৫০,৯৭৫	-০.৪
৯৬	অস্ট্রিয়া	৮,৫৬৯,৬৩৩	৮,৫৪৪,৫৮৬	+০.৩
১০৩	হংকং	৭,৩৪৬,২৪৮	৭,২৮৭,৯৮৩	+০.৮
১০৪	বুলগেরিয়া	৭,০৯৭,৭৯৬	৭,১৪৯,৭৮৭	-০.৭
১১৪	ডেনমার্ক	৫,৬৯০,৭৫০	৫,৬৬৯,০৮১	+০.৪

১১৫	ফিনল্যান্ড	৫,৫২৩,৯০৪	৫,৫০৩,৪৫৭	+০.৪
১১৭	স্লোভাকিয়া	৫,৪২৯,৪১৮	৫,৪২৬,২৫৮	+০.১
১২৪	আয়ারল্যান্ড	৪,৬৭৩,৯৯৩	৪,৬৮৮,৪৬৫	+০.৫
১২৭	নিউজিল্যান্ড	৪,৫৬৫,১৮৫	৪,৫২৮,৫২৬	+০.৮
১২৮	ক্রোয়েশিয়া	৪,২২৫,০০১	৪,২৪০,৩১৭	-০.৪
১৩০	মলডোভা	৪,০৬২,৮৬২	৪,০৬৮,৮৯৭	-০.১
১৩৩	জর্জিয়া	৩,৯৭৯,৭৮১	৩,৯৯৯,৮১২	-০.৫
১৩৪	বসনিয়া	৩,৮০২,১২৪	৩,৮১০,৪১৬	-০.২
১৩৭	আর্মেনিয়া	৩,০২৬,০৪৮	৩,০১৭,৭১২	+০.৩
১৪০	লিথুনিয়া	২,৮৫০,০৩০	২,৮৭৮,৪০৫	-১.০
১৪১	জ্যামাইকা	২,৮০৩,৩৬২	২,৭৯৩,৩৩৫	+০.৪
১৪৭	স্লোভেনিয়া	২,০৬৯,৩৬২	২,০৬৭,৫২৬	+০.১
১৪৯	লাতিভিয়া	১,৯৫৫,৭৪২	১,৯৭০,৫০৩	-০.৭
১৫৩	ত্রিনিদাদ ও টোব্যাকো	১,৩৬৪,৯৭৩	১,৩৬০,০৮৮	+০.৪
১৫৬	মৌরিসাস	১,২৭৭,৪৫৯	১,২৭৩,২১২	+০.৩
১৫৮	সাইপ্রাস	১,১৭৬,৫৯৮	১,১৬৫,৩০০	+১.০
১৬৫	ঘানা	৭৭০,৬১০	৭৬৭,০৮৫	+০.৫
১৭৫	মাল্টা	৪১৯,৬১৫	৪১৮,৬৭০	+০.২
১৮০	আইসল্যান্ড	৩৩১,৭৭৮	৩২৯,৪২৫	+০.৭
২০৫	বারমুডা	৬১,৬৬২	৬২,০০৫	-০.৬
২০৭	গ্রীনল্যান্ড	৫৬,১৯৬	৫৬,১৮৬	০.০
২২৪	ওয়ালস ও ফাতুনা	১৩,১১২	১৩,১৫১	-০.৩

Source : *United Nations Department of Economic and Social Affairs.*[২২৮]

যেসব দেশ স্বাধীনতার নামে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছে,

২২৮. "Total Population-Both Sexes". World Population Prospects, the 2015 Revision, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Population Estimates and Projections Section, July 2015. Retrieved 1 June 2016.

তাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিতান্তই সামান্য। যৌনতার মাত্রাতিরিক্ত ছড়াছড়ি ভেঙে দিয়েছে তাদের পারিবারিক বাঁধন।[২২৯] বিবাহ তাদের কাছে নিছক সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়া কিছুই নয়। তাদের যুবক যুবতীরা আবেগের বশে বিবাহ করে ঠিক, কিন্তু তার স্থায়িত্বকাল একেবারেই সামান্য সময় হয়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুল বোঝাবুঝি তাদের সম্পর্ককে নিমিষেই চুরমার করে দেয়। একদিনে যৌবনকে উপভোগের সামগ্রী আর অপরদিকে গর্ভ নিরোধক সামগ্রী—দুটোই সহজলভ্য হওয়ায় অনাগত সন্তান পৃথিবীর আলো দেখার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে। ফলত জনসংখ্যার এক বিশাল ঘাটতি নিয়ে তারা সামনের দিকে এগোচ্ছে।

❋ ওদের দেশে কেন এগুলো ছড়াচ্ছে?

তাদের দেশে বিবদমান এসব সমস্যাগুলোর কারণ কী? ওদের অর্থ, বিত্তবৈভব কিংবা শিক্ষার তো কোনো কমতি নেই। তবুও ওদের দেশে নারীদের অতিমাত্রায় ধর্ষণ, লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা ও সহিংসতার পরিমাণ কেন দিন দিন বাড়ছে? কেন যৌনরোগগুলো মহামারি আকারে ছড়াচ্ছে? কেন নারীরা সন্তান গ্রহণে আগ্রহ হারাচ্ছে? কেন পরিবার ও পারিবারিক বাঁধন সমাজ থেকে উঠে যাচ্ছে? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে।

■ স্রষ্টার নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ কেবল ধ্বংসই ডেকে আনে :

আল্লাহ অন্যান্য প্রাণীর মতো মানবজাতিকেও নারী এবং পুরুষ এই দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। পরস্পরের মধ্যে প্রদান করেছেন সীমাহীন আকর্ষণবোধ। হ্যাঁ, অন্যান্য প্রাণীতেও এ আকর্ষণ দিয়েছেন। তাই তারা পারস্পরিক যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যৌন আকর্ষণবোধ পশু-প্রাণীর চেয়ে ঢের বেশি। নারী-পুরুষের মধ্যে এক চিরন্তন যৌনবোধ ও যৌনাকর্ষণ বিদ্যমান। তাদের দৈহিক গঠন, চালচলন,

---

২২৯. হুমায়ুন আজাদও পরিবার ও পারিবারিক প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এবং বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্ককে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন,

"ইউরোপ আমেরিকা মেনে নিচ্ছে সমকাম ও সমলৈঙ্গিক বিয়ে, চলছে স্বামীস্ত্রী বিনিময়, এবং সেখানে গোপনে চলছে সম্মেলিত বিয়ে বা কাম, ও আরো অজস্র রীতি। যদি কোনো পুরুষ একাধিক নারীর সাথে বিবাহিত ও অবিবাহিত জীবন যাপন করতে চায়, তারা সবাই যদি তাতে সুখী হয়, তাতেও কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়। তাদের ওই জীবনযাপন অন্য কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, সুখী করে তাদের; তাই তা অনৈতিক নয়। মানুষ ক্রমশ সেদিকেই এগোচ্ছে, বর্তমানের অনৈতিক নৈতিকতা বেশি দিন তাদের বাধা দিয়ে আটকে রাখতে পারবে না। একদিন সমাজ থেকে উঠে যাবে কাম ও অধিকারভিত্তিক বিবাহ, পরিবার, ও নৈতিকতা।" [আমার অবিশ্বাস, পৃষ্ঠা : ১৪২]

কথাবার্তা এমনকি চোখের দৃষ্টির মধ্যেও বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে। পশুদের মধ্যে যৌনচাহিদা সীমিত আকারে থাকে বলেই তারা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যায় না। বিপরীত প্রজাতির সাথে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করে না। কিন্তু মানুষের যৌনচাহিদা তাকে এতটাই প্রভাবিত করে যে, যদি তার লাগাম না টেনে ধরা যায়, তাহলে সে পোষা কুকুরকেও যৌনসঙ্গী করতে দ্বিধাবোধ করে না। মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই যৌন উদ্দীপনার কাছে অসহায়। প্রশ্ন হতে পারে, নারী-পুরুষের মধ্যে এতটা আকর্ষণ কেন দেওয়া হয়েছে?

না, নিছক সেক্স বা বংশবৃদ্ধির জন্যে এ আকর্ষণ দেওয়া হয়নি। এই চাহিদা প্রদান করা হয়েছে পারস্পরিক সঙ্গলাভ, আন্তরিক সংযোগ এবং আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে। মানুষের অত্যধিক যৌনবাসনা প্রদানের কারণ এটা নয়, সে পশুদের তুলনায় অধিক যৌনক্রিয়া করবে। বরং যৌন-সম্পর্কের পাশাপাশি একে অপরকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করবে। আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করবে। এই কারণে মানুষের মধ্যে যতটা যৌনচাহিদা দেওয়া হয়েছে—তার সবটা যদি কেউ ব্যবহার করে—তাহলে তার শরীর ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়বে।

পশুদের সন্তান মানুষের সন্তানের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু মানবশিশুকে লালন-পালন করে বড় করতে হয়। আর এর পেছনে এমন কারও ভূমিকা থাকতে হয়, যে নিজের জীবনের থেকেও ওই নব্য প্রসূত সন্তানকে আপন করে দেখবে। কেননা, মানবশিশুর এ ক্ষমতাই নেই যে, সে নিজের মৌলিক চাহিদাগুলো নিজে পুরো করবে। এ ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণই অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই বাচ্চা জন্মের সাথে সাথে মহান স্রষ্টা মা-বাবার মধ্যে কল্পনাতীত ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন, যা তাকে টিকে থাকতে সহায়তা করে। মা-বাবা যে কারণে একে অপরের সঙ্গী হন তার কারণ হলো, পারস্পরিক যৌনাকর্ষণ। এই আকর্ষণই তাদের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে। আর এভাবেই সামাজিক সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে।

প্রাকৃতিকভাবেই নারীদের প্রতি পুরুষদের আকর্ষণ একটু বেশি থাকে। পশুপাখিদের পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের তুলনার বেশি সুশ্রী ও আকর্ষণীয়। কিন্তু মানবজাতির বেলায় নারীরা অধিক সুশ্রী ও আকর্ষণীয়। এই আকর্ষণের মাত্রা আরও বেড়ে যায়—যখন সমাজব্যবস্থা তাতে সুড়সুড়ি প্রদান করে। নারীদের বেশভূষা যতটা অশ্লীল হয়, নারীদের চলাফেরা যতটা উচ্ছৃঙ্খল হয়, নারীদেহ যতটা সস্তা হয়—পুরুষদের ওপর ঠিক ততটাই বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেননা, “প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে”।

পুরুষদের সামনে যত যৌন উদ্দীপক জিনিসের প্রসার ঘটবে, তাদের উত্তেজনার মাত্রাও ঠিক সে হারেই বাড়বে। শুধু পুরুষদের নয়, নারীদেরও বাড়বে। তাই তো উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন বাড়ছে নারী পতিতালয়, ঠিক তেমন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পুরুষ পতিতালয়। আসলে যৌনতা একটি সংক্রামক ব্যাধি, যা নিয়ন্ত্রণে না রাখলে তা মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ধ্বংস করে গ্রাম-নগর-বন্দর ও সভ্যতার বিকাশকে। আর যৌনতার বিকাশ ঘটে পর্দাহীনতা থেকে। যখন নারী-পুরুষ পর্দার বিধানকে অবজ্ঞা করে অবাধ মেলামেশা শুরু করে, তখন নৈতিকতার ব্যাপক পদস্খলন ঘটে। হয়তো বলতে পারেন, আমি নারী ও পুরুষের মেলামেশার অবাধ মেলামেশার পাশাপাশি যদি নৈতিক অবক্ষয়ও নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তো সমস্যা কোথায়? সমস্যা এখানেই যে, আপনি ট্রেনের টিকিট কাটাকেও বাধ্যতামূলক করলেন, আবার বিনা টিকিটে ভ্রমণ করাকে অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা থেকেও দূরে থাকলেন।

নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা নৈতিকতার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না, এ দাবি বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পারস্পরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া তো দূরের কথা, অন্তরে লুক্কায়িত বাসনাও নৈতিকতার ওপর প্রভাব ফেলে। আর যদি এই ভেবে অবাধ মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি করতে চান যে, অবাধ মেলামেশা আধুনিকতার নির্ণায়ক; তাহলে আমি বলব, পশুরা আপনার চেয়ে বেশি আধুনিক। কেননা, তাদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা নিয়ন্ত্রণহীন ও অবাধ। তারা রাস্তাঘাটেই তাদের যৌন উত্তেজনাকে প্রশমিত করে।

পশ্চিমের আধুনিক সমাজে সমাজ থেকে হারিয়ে গেছে সামাজিক মূল্যবোধ। দিন দিন কমে যাচ্ছে তাদের জনসংখ্যা, বাড়ছে মরণঘাতী বিভিন্ন যৌনরোগ। এইডস তো তাদের দেশে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের পারিবারিক বন্ধন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। নৈতিকতা তো তাদের হতে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। যার ফলে সন্তান নিজের মাতার সাথে, বাবা নিজের মেয়ের সাথে, ভাই নিজ বোনের সাথে অযাচার করছে। কেন এই অবস্থা তাদের? কেন শিক্ষা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারছে না? প্রচার-প্রচারণা কেন নারী সহিংসতা কমাতে পারছে না? কেন উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা যৌনরোগের মহামারি থামাতে পারছে না?

এর কারণ হলো—তারা নিজেদের স্রষ্টার বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তারা স্রষ্টার মনোনীত পর্দার বিধানকে অবজ্ঞাসুরে দূরে ফেলে দিয়ে প্রবৃত্তিকে আদর্শ বানিয়েছে। যার ফলে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, শিক্ষা-দীক্ষার ছড়াছড়ি থাকা সত্ত্বেও এতটা অধঃপতন ঘটছে।

■ স্রষ্টার বিধান অবজ্ঞার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিছু সমস্যা :

আসলে স্রষ্টার বিধান অবজ্ঞা করলেই বিপত্তির সূচনা ঘটে। এর ফলে সভ্যতার নামে, আধুনিকতার নামে, স্বাধীনতার নামে এমন কিছু সমস্যা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সমাজ-কাঠামোকে সমূলে উৎপাটন করে দেয়। আমরা কিছু সমস্যা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি :

১. মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবেই যৌনচাহিদা বিদ্যমান। আর এই যৌনচাহিদা পূরণের জন্যে যখন বিয়ে ছাড়া অন্যান্য পথ বিদ্যমান থাকবে, তখন মানুষ তা লুফে নেবে। এটাই স্বাভাবিক। যার কারণে আমরা দেখি, পাশ্চাত্যের অনেক নারী ১ম বিয়ে করে পাঁচ সন্তান সাথে নিয়ে। তাদের সমাজে বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্ক খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয় না। তাদের দেশে মানুষ বিয়ের পূর্বেই যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করে। যার ফলে তাদের দেশে বিয়েটা কেবল কদিনের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া কিছুই নয়। তাদের পারিবারিক সম্পর্ক স্থায়ী না হওয়ার কারণও এটাই। আর পারিবারিক সম্পর্ক মজবুত না হওয়ায় কমে যাচ্ছে সন্তান নেওয়ার প্রবণতা। ফলে জনসংখ্যার বিশাল ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। কমে যাচ্ছে জন্মহার।

যখন কোনো সমাজ অশ্লীল কর্মকেও ভালো চোখে দেখা শুরু করবে, তখন তার জনগণকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না। যৌনতার যে ঘোড়ার লাগাম এতদিন হাতে ছিল, সেটাকে সে লাগামহীন করে দেবে। সমাজের সর্বত্রই যখন যৌনতার ছড়াছড়ি, আর নৈতিকতা যখন ডাস্টবিনে, তখন জনগণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করবে কীভাবে? আর এর মধ্যে সমাজ যখন সুড়সুড়ি দিতে থাকবে, তখন সেটার মাত্রা বাড়বে এটাই তো স্বাভাবিক। আসলে বিবাহ ও অবাধ যৌনাচার পাশাপাশি একই সমাজের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

বিয়ের অন্যতম কারণ হলো জৈবিক চাহিদা পূরণ করা। আর এই চাহিদা যখন বিয়ে ছাড়াই পূর্ণ করা যাবে, তখন কেই-ই বা বিয়ে করে যৌবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করবে? আর বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সম্পর্ক বেড়ে গেলে আপনা-আপনিই সন্তান গ্রহণে অবহেলা, ভ্রূণ হত্যা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বেড়ে যাবে। কেননা, সন্তান প্রতিপালন এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এর জন্যে অনেক ত্যাগ, অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। অনেকটা সময় সন্তানকে বড় করার জন্যে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু যৌনতার সাগরে যারা হাবুডুবু খাচ্ছে, তারা সন্তান পালনের এতটা সময় কীভাবে ম্যানেজ করবে? গর্ভধারণের জন্যে নয়টা মাস কোথায় পাবে? ফলে টাকা দিয়েও কাউকে সন্তান

গ্রহণে আগ্রহী করে তোলা যাবে না।

২. অশ্লীলতার সাথে পতিতাবৃত্তির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পশ্চিমে দেশগুলোতে পতিতালয় ও পতিতার ছড়াছড়ি ঘটেছে। তাদের মদের বার, সমুদ্রসৈকত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আবাসিক হোটেলে, বাজারে কোথাও পতিতার অভাব নেই। আর বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্ককেই তারা বেশি উপভোগ করে। বিয়ের পরিবর্তে Live together-কে বেশি অগ্রাধিকার দেয়। আবার অনেকেই দেখা যায় বিয়ের পূর্বে ডজন খানেক প্রেম আর শারীরিক সম্পর্ক করার পর বিয়ে করে। এভাবে যৌনরোগের সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠছে। কামোদ্দীপনা বাড়ানোর জন্যে পর্নোগ্রাফি, মাদক, সেক্স টয়, যৌন উত্তেজক সামগ্রী তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৩. যখন অশ্লীল ও যৌন উত্তেজক জিনিস সহজলভ্য হয়ে যায়, তখন যৌনতা মাত্রাতিরিক্ত ছড়াছড়ি লাভ করে। ফলে নৈতিকতার সীমাহীন অবক্ষয় ঘটে। এই অবক্ষয়ের ফলে মানুষের মাঝে পশুত্বের গুণাবলি জাগ্রত হয়। এই পশুবৃত্তি হতে জন্ম নেয় বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ, যেমন : ধর্ষণ, সমকামিতা[২৩০], পশুকামিতা, ইভটিজিং, যৌন-সহিংসতা ইত্যাদি। যে সমাজে যৌন উত্তেজক জিনিস সহজলভ্য হয়ে যায় আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা থাকে, সেখানে ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, একদিকে অশ্লীল জিনিসগুলো মানুষকে যৌন উদ্দীপনা দিতে থাকে, অপরদিকে অবাধ মেলামেশা সে উদ্দীপনার বাস্তব রূপ প্রদানকে সজলভ্য করে তোলে। ফলে ধর্ষণ তো বটেই, সমকামিতা ও পশুকামিতার মতো অস্বাভাবিক কার্যকলাপও অত্যন্ত মামুলি ব্যাপারে পরিণত হয়। (পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশে পশুকামিতা এতটাই বিস্তার লাভ করেছে যে, কুকুরের মালিক কুকুরকে একাকী রাস্তায় ছাড়া বিপজ্জনক মনে করছে। পাছে তার স্নেহাস্পদ কুকুরটি কারও দ্বারা ধর্ষিত হয় কি না, তাই।) এভাবে সমকামিতা, পশুকামিতা, বহুগামিতা বিভিন্ন যৌনরোগ সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কালক্রমে যৌন-ব্যাধিগুলো মহামারির

---

২৩০. নাস্তিকদের শিক্ষাগুরু ড. আজাদও চেয়েছেন নারীরা যাতে সমকামিতার মাধ্যমে তাদের যৌনচাহিদাকে পূর্ণ করে। এটা নাকি নারীর বৈধ (!) অধিকার। তিনি বলেন,

"প্রতিটি মেয়ের এবং ছেলের মধ্যেই রয়েছে সমকামীপ্রবণতা; তরুণীর ওই প্রবণতার মূলে রয়েছে তার আত্মপ্রেম। তরুণীরা পরস্পরের শরীরে খুঁজে পায় নারীত্ব। কিন্তু তরুণী জানে সমকামী সম্পর্ক অস্থায়ী; এবং অনেক তরুণী এ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ারও সুযোগ পায় না, অনেকে পেয়েও গ্রহণ করে না। প্রচণ্ড বিধিনিষেধের খড়্গ ঝুলে তার ওপর; সমগ্র পিতৃতন্ত্র তাকে নিষেধ করে ওই সম্পর্কে যেতে।

[*নারী*, পৃষ্ঠা : ২১৩]

যাদের মাথায় সমকামিতার ভূত চেপে আছে, তারা *সংবিৎ* বইয়ের ৬৮-৮৭ পৃষ্ঠায় একটু নজর বুলিয়ে আসুন। তাহলে সমকামিতার ভূত আর মাথায় চাপবে না ইন শা আল্লাহ।

ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে।

৪. যৌনব্যাধিগুলো কেবল আক্রান্ত ব্যক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, উপরন্তু তা সমাজেও বিস্তার লাভ করে। এইডসের কথাই ধরুন। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত অন্যকে প্রদানের দ্বারা, দুগ্ধ পান করানোর দ্বারা স্থানান্তরিত হতে পারে। অদ্যাবধি এর কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য। আর বাকি যে যৌনরোগগুলো রয়েছে, ওগুলোতে আক্রান্ত ব্যক্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। এসব যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত বাবা-মায়ের কারণে নিষ্পাপ শিশুটিও জীবাণু ধারণ করতে বাধ্য হয়। সংক্রামক ব্যাধিগুলো এভাবেই সমাজে ছড়িয়ে পড়বে এবং তা সমাজের অন্যান্য নিরীহ লোকের প্রাণনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি—অশ্লীলতা তখনই ছড়ায়, যখন মানুষ নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে ভুলে যায়। এর ফলে তাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অবাধ মেলামেশা অশ্লীলতার বিস্তার ঘটায়। আর এই অশ্লীলতা সমাজে এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটাতে সাহায্য করে, যা সমাজের মধ্যে পশুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে। আর পশুপ্রবৃত্তি এমন হিংস্রতার জন্ম দেয়, যার কারণে মানুষ যৌনবাসনার মিতাচার ভুলে যায়। সে তখন নিজের মা কিংবা গার্লফ্রেন্ডের পার্থক্য বোঝে না। কিংবা বয়ফ্রেন্ড ও বাবার মধ্যে আলাদা কিছু দেখে না। যৌনতাই তার কাছে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আর নৈতিকতা ঘৃণার পাত্র বলে বিবেচিত হয়।

এভাবে যৌনতা যখন একেবারে সহজলভ্য হয়ে যায়, তখন সে সমাজে অযাচার, ধর্ষণ, ইভটিজিং, নারী-সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। আর তা নিয়ন্ত্রণ না করলে, আস্তে আস্তে মহামারিতে রূপান্তরিত হয়। যার ফলাফল হলো মৃত্যু। একটি সভ্যতা এভাবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রাচীন গ্রিসও অশ্লীলতার কারণে ধ্বংসের শিকার হয়েছে, প্রাচীন রোমান সভ্যতাও একই কারণে বিলীন হয়েছে। শিল্প-বিপ্লবও একই কারণে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতাও আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে।

❋ বাঁচার উপায় কী?

এর থেকে বাঁচার উপায় কী? কোন পদ্ধতিতে সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়কে নির্মূল করা যায়? এর একটাই সমাধান—অশ্লীলতা রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আর পর্দা হলো অশ্লীলতা প্রতিরোধের অন্যতম উপায়। যা নারী-পুরুষকে

নির্দিষ্ট দূরত্বে রেখে সমাজ বিনির্মাণের সুযোগ করে দেয়। তাই সমাজ-কাঠামোকে ঠিক রাখতে তিন দফা সংরক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি।

ক. আত্মিক সংস্কার।

খ. যৌন-সহিংসতা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।

গ. এই বিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

■ ক. আত্মিক সংস্কার :

প্রথমেই সমাজের লোকদের আত্মিক সংস্কারের দিকে নজর দিতে হবে, যাতে বলপ্রয়োগ ছাড়াই মানুষ নিজে থেকে খারাপ কাজে অনুৎসাহ বোধ করে। এ জন্যে লজ্জার শিক্ষা দিতে হবে। ইসলাম ঈমানের সাথে লজ্জার শিক্ষা প্রদান করেছে। লজ্জাকে ঈমানের অন্যতম শাখা হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

"লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।"[২৩১]

লজ্জা অন্যতম একটি বিষয়, যা মানুষকে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। যার লজ্জা আছে, সে কখনোই অশ্লীল কাজে যুক্ত হবে না। অশ্লীল কাজে সহযোগী হবে না। এমনকি তার দ্বারা অশ্লীল কাজে সমর্থন পাওয়া যাবে না। তাই ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই লজ্জা শিখিয়েছে। ইসলাম এও শিখিয়েছে যে, মুসলিম সেই হতে পারবে—যে অপর মুসলিমকে নিজের হাত থেকে (যেমন : ধর্ষণ), নিজের জিহ্বা (যেমন : ইভটিসিং) থেকে নিরাপদ রাখবে। রাসূল ﷺ বলেন,

"প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ।"[২৩২]

পাশাপাশি ইসলাম এটিও জানিয়েছে, প্রত্যেকটি অঙ্গের আলাদা আলাদা যিনা আছে। কেউ যদি চোখ দিয়ে অশ্লীলতা উপভোগ করে, তো সেটি চোখের যিনা বলে গণ্য হবে। কান দিয়ে অশ্লীল কিছু শুনলে, সেটি কানের যিনা হিসেবে গণ্য হবে। অন্তর দিয়ে অশ্লীল জিনিস অনুভব করলে, সেটি অন্তরের যিনা হিসেবে গণ্য হবে। রাসূল ﷺ বলেন,

"চোখের যিনা হলো তাকানো। জিহ্বার যিনা হলো কথা বলা। কুপ্রবৃত্তি কামনা ও

---

২৩১. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ঈমান, ১/৮, ২৩

২৩২. বুখারি, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ঈমান, ১/৯

খায়েশ সৃষ্টি করে এবং যৌনাঙ্গ তা সত্য-মিথ্যা প্রমাণ করে।"[২৩৩]

অন্য বর্ণনায় আছে,

"দুই হাত যিনা করে। হাতের যিনা হচ্ছে স্পর্শ করা। দুই পা যিনা করে। (পা দিয়ে) অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে পায়ের যিনা। মুখও যিনা করে। চুমু খাওয়া হচ্ছে মুখের যিনা। কানের যিনা হচ্ছে (অশ্লীল) আলাপ শোনা।"[২৩৪]

এ ছাড়াও যিনা-ব্যভিচারকে ঈমান বিধ্বংসী জিনিস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন,

"ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মুমিন থাকে না। চুরি করার সময় চোরও ঈমানদার থাকে না। মদ্যপায়ীও মদ্যপান করার সময় মুমিন থাকে না।"[২৩৫]

■ খ. যৌন-সহিংসতা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা :

ইসলাম নারী-সহিংসতা প্রতিরোধ করার জন্যে কিছু নীতিমালা প্রদান করেছে। সংক্ষেপে আমরা তার কয়েকটি নীতিমালা নিয়ে আলোকপাত করব।

১. দৃষ্টির ক্ষেত্রে পর্দা :

মানুষের দৃষ্টিশক্তি অনেক শক্তিশালী। চোখের মাধ্যমে মানুষ ভাব বিনিময় করতে পারে, যা অন্যান্য প্রাণী পারে না। মানুষ চোখের ইশারায় অকল্পনীয় কাজ সম্পাদন করতে পারে। তাই চোখের অনিষ্ট থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। দৃষ্টিকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, যাতে দৃষ্টি অশ্লীলতার দিকে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

"মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্যে অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।"[২৩৬]

---

২৩৩. বুখারি, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : অনুমতি চাওয়া, হাদীস নং : ৫৮০৯

২৩৪. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আসআশ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : বিবাহ, হাদীস নং : ২১৫৩, ২১৫৪

২৩৫. মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : ঈমান, ১/১১০, ১১৬, ১১৭

২৩৬. সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩০

আল্লাহ ﷻ নারীদের লক্ষ্য করে বলেছেন :

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারও কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[২৩৭]

যখন মানুষ দৃষ্টিকে নত রাখবে, তখন সে সময়ে সময়ে যৌন-উদ্দীপ্ত হবে না। ফলে যৌন-সহিংসতা হ্রাস পাবে। ধর্ষণ, ইভটিসিং একেবারেই কমে যাবে। তাই তো জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ﵁ যখন রাসূল ﷺ-এর কাছে হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি ﷺ তাঁকে চোখ ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দেন।[২৩৮]

২. পোশাকের ক্ষেত্রে পর্দা :

পোশাকের ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের জন্যে আলাদা আলাদা বিধান থাকতে হবে। নারীরা এমন পোশাক পড়তে পারবে না, যা পুরুষের কামপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে। আবার পুরুষরাও এমন কিছু করতে পারবে না, যাতে নারীদের কামনা জেগে ওঠে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

---

২৩৭. সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩১

২৩৮. মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : শিষ্টাচার, হাদীস নং : ৫৪৫৯; আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আসআশ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : বিবাহ, হাদীস নং : ২১৪৮

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

"হে আদমসন্তান, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্যে এবং শোভা বর্ধনের জন্যে আমি পোশাক অবতীর্ণ করেছি। আর তাকওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক। এটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"[২৩৯]

নারীদের পোশাক সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

"হে নবি, তুমি তোমার স্ত্রীদের ও কন্যাদের এবং মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[২৪০]

নারীদের পুরুষের মতো আর পুরুষদের নারীর মতো পোশাক পরা থেকে বিরত থাকতে হবে।[২৪১] নারীরা যদি পুরুষদের মতো পোশাক পরিধান করে, তো তাদের গোপন অঙ্গগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়বে। পুরুষরা তাদের দিকে আকৃষ্ট হবে। এভাবে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করবে।

৩. সৌন্দর্য প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে পর্দা :

নারীরা এমন কিছু ব্যবহার করতে পারবে না, যা দ্বারা পুরুষরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা তাদের সৌন্দর্য, রূপ-লাবণ্য স্বামী ব্যতীত কারও সামনে প্রকাশ করতে পারবে না। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

"জাহিলি যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করবে না।"[২৪২]

---

২৩৯. সূরা আল-আরাফ, ৭ : ২৬

২৪০. সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৫৯

২৪১. বুখারি, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : পোশাক-পরিচ্ছদ, ৯/৫৪৬৫; নাবাবি, মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনু শরাফ, *রিয়াদুস সালিহীন*, অধ্যায় : নিষিদ্ধ কাজসমূহ, ৪/১৬৩৯, ১৬৪০

২৪২. সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৩৩

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"আর তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে।"[২৪৩]

তেমনি নারীরা সুগন্ধি মেখে এ উদ্দেশ্যে বাইরে বেরোতে পারবে না, যেন পুরুষেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। রাসূল ﷺ বলেন,

"প্রতিটি চোখই যিনাকারী। কোনো নারী যদি সুগন্ধি মেখে কোনো মজলিসের পাশ দিয়ে যায় (আর পুরুষরা তার সুগন্ধ অনুভব করতে পারে) তবে সে এমন (অর্থাৎ যিনাকারিণী)।"[২৪৪]

সুগন্ধির মাধ্যমে পুরুষদের আকৃষ্ট করাটা জাহিলি যুগের পতিতাদের মতো নিকৃষ্ট কাজ। সে সময়ে পতিতারা খদ্দেরদের আকৃষ্ট করার জন্যে বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধি মেখে বাইরে বেরোত; তাই সুগন্ধির মাধ্যমে পুরুষদের আকৃষ্ট করার কাজকে ব্যভিচারের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৪. কথার ক্ষেত্রে পর্দা :

নারীরা কথাবার্তার মাধ্যমে পুরুষকে আকর্ষণ করতে না পারে সে লক্ষ্যে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

"হে নবিপত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বোলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা সংগত কথাবার্তা বলবে।"[২৪৫]

অনুরূপ পুরুষরাও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখবে। বেগানা নারীদের সাথে একাকী কিংবা নির্জনে সাক্ষাৎ করবে না। একান্ত যদি দেখা করতেই হয়, তবে পর্দার আড়াল থেকে

---

২৪৩. সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩১

২৪৪. তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আদব, হাদীস নং : ২৭৮৬

২৪৫. সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৩২

করবে। কুরআন কারীমে এই বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"তোমরা তাঁর স্ত্রীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।"[২৪৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখ বিন বায ﷺ বলেন,

"এই আয়াতের মাধ্যমে পুরুষদের থেকে নারীদের সম্পূর্ণ পর্দা করার ও আড়ালে থাকার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এখানে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, পর্দার এই বিধান নারী-পুরুষ সবার অন্তরকে অধিকতর পবিত্র রাখে এবং অশ্লীলতা ও তার কারণাদি থেকে তাদের দূরে রাখে। এ থেকে বোঝা যায়, পর্দাপালন হচ্ছে পবিত্রতা ও নিরাপত্তা আর পর্দাহীনতা হচ্ছে অপবিত্রতা ও অশ্লীলতা।"[২৪৭]

■ গ. এই বিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা :

যেসব জিনিস মানুষকে অশ্লীলতার দিকে আকৃষ্ট করে, সেগুলোকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করতে হবে, যেমন : গান, বাদ্যযন্ত্র, নারীদেহ-সংবলিত বিলবোর্ড, পর্নোগ্রাফি, সিনেমা ইত্যাদি। কেননা, এগুলো মানুষকে যৌন সুড়সুড়ি প্রদান করে। কামোদ্দীপনা জাগ্রত করে। যার ফলে মানুষ অশ্লীলতার দিকে ধাবিত হয়। অশ্লীলতা প্রসারকারীদের সতর্ক করে আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

"যারা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীল জিনিসের প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না।"[২৪৮]

পাশাপাশি ব্যভিচারের জন্যে এমন শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কেউ এর

---

২৪৬. সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৫৩
২৪৭. বিন বায, আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ, *ইসলামি হিজাব*, পৃষ্ঠা : ৫
২৪৮. সূরা আন-নূর, ২৪ : ১৯

পুনরাবৃত্তি ঘটাতে সাহস না করে।[২৪৯] আল্লাহ ﷻ ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা করে বলেছেন :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—এদের প্রত্যেককে এক শ করে বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকর কারতে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[২৫০]

তবে ব্যভিচারের শাস্তি যেমন কঠিন, ব্যভিচার প্রমাণ করাও তেমন কঠিন। অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণত দুজন সাক্ষীই যথেষ্ট, কিন্তু ব্যভিচার প্রমাণের জন্যে চারজন সাক্ষীর দরকার হয়। আর কেউ ব্যভিচারের অপবাদ দিলে, তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়। এটা এই জন্যে যে, যাতে কেউ অযথা হয়রানির শিকার না হয়। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

"যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং (তা প্রমাণের জন্যে) চারজন সাক্ষী হাজির করে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করবে না। এরাই সত্যত্যাগী।"[২৫১]

✸ সংশয় নিরসন

ইসলাম কেবল নারীদের জন্যে পর্দার বিধান নাযিল করেননি; বরং তার আগে পুরুষদের পর্দার কথা বলেছে। ইসলাম যেমন নারীদের জন্যে মাহরাম ব্যতীত অন্যদের সামনে পর্দা করাকে আবশ্যক করেছে, ঠিক তেমনি আবশ্যক করেছে পুরুষদের জন্যেও। ইসলাম যেমন চায় না কোনো পুরুষ বেগানা নারীর সাথে সহাবস্থান করুক,

২৪৯. অশ্লীলতা দমানোর বিধান অবশ্য হুমায়ুন আজাদকে ব্যথিত করেছে। তিনি বলেছেন, *"চুরির অপরাধে হাত কেটে ফেলা বা অবিবাহিত সঙ্গমের জন্যে পাথর ছুড়ে হত্যা নীতির দিক থেকে অত্যন্ত শোচনীয়।"* [*আমার অবিশ্বাস*, পৃষ্ঠা : ১০১]

২৫০. সূরা আন-নূর, ২৪ : ২

২৫১. সূরা আন-নূর, ২৪ : ৪

ঠিক তেমনি ইসলাম এটাও চায় না—কোনো নারী বেগানা যুবকের সাথে সহাবস্থান করুক। ইসলাম যেমন নারীদের পোশাকের নির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করেছে, ঠিক তেমনি বিধান প্রণয়ন করেছে পুরুষদের জন্যে। নারীদের পোশাকের ধরন, রং, পোশাকের মাত্রা ইত্যাদি যেমন নির্ধারিত, ঠিক তেমনি নির্ধারিত রয়েছে পুরুষদের জন্যে।

ইসলামবিদ্বেষীরা কেবল নারীদের পর্দার সমালোচনা করে। কিন্তু ইসলাম যে পুরুষদের জন্যেও পর্দাকে আবশ্যক করেছে, এর আলোচনা তাদের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পর্দা মানে অবরোধ নয়, পর্দা মানে নারীকে ঘরের কোণে বন্দী করে রাখা নয়, পর্দা মানে নারীকে স্বাবলম্বী হতে বাধা দেওয়া নয়, পর্দা মানে নারীদের শিক্ষা থেকে দূরে রাখা নয়, পর্দা মানে নারীদের বাইরে বের হওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া নয়। পর্দা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান (Dress Code)। আল্লাহ ﷻ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

"হে নবি, তুমি তোমার স্ত্রীদের ও কন্যাদের এবং মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[২৫২]

কেউ যদি পর্দার মাধ্যমে সমাজে চলাফেরা করে, তাহলে তাকে অতি সহজেই চেনা যায় যে, সে মুসলিম নারী। আর যে সমস্ত মহিলারা পর্দা করে স্বভাবতই তাদের যুবকেরা উত্ত্যক্ত করে না; বরং তাদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। সমাজে নারীদের উত্ত্যক্ত, ধর্ষিত, নিগৃহীত হওয়া থেকে বাঁচার অন্যতম মাধ্যম হলো পর্দা। হয়তো বলতে পারেন, পর্দা কেন একমাত্র মাধ্যম হবে? আমরা তো বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, শিক্ষা, সভা, সেমিনার এসবের মাধ্যমে নারী-সহিংসতা কমাতে পারি।

আসলে এগুলো হয়তো সাময়িক কিছু ফলাফল এনে দিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি কোনো সমাধান এনে দিতে পারবে না। শিক্ষা, সেমিনার, সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ইত্যাদি যদি সমাধান এনে দিতে পারত, তবে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এত এত নারী-সহিংসতার ঘটনা ঘটত না। ওদের শিক্ষার হার আমাদের থেকে বেশি। ওদের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের জন্যে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এর পরেও তারা নারী-সহিংসতা কমাতে পারছে না, দিন দিন তা বেড়েই চলছে।

২৫২. সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৫৯

পর্দাহীনতা তাদের সমাজে কেবল ধর্ষণ নয়, যৌনতার মাত্রাতিরিক্ত প্রসার ঘটিয়েছে। যৌনতা তাদের সমাজকে অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। অশ্লীলতা তাদের পারিবারিক কাঠামো ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, জন্মাহারকে ক্রমবর্ধমান নিম্নমুখী করে তুলেছে, যৌনরোগের মহামারি তৈরি করেছে, নৈতিকতার চরম অবক্ষয় এনে দিয়েছে।

তাই ফিরে আসতে হবে স্রষ্টার বিধানের দিকে। এতেই মানবজাতির জন্যে কল্যাণ। আমরা পর্দা-বিষয়ক আলোচনার ইতি টানছি একটি প্রবন্ধ দিয়ে। প্রবন্ধটি লিখেছেন খাওলা নিকিতা। তিনি একজন জাপানী নাগরিক। বর্তমানে তার স্বামীর সাথে রিয়াদে অবস্থান করেন। বেশ ক-বছর আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এর আগে তিনি নাস্তিক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সৌদির আল-কাসীম প্রদেশের বুরাইদা শহরের ইসলামি দাওয়াহ কেন্দ্রে আসেন, এবং উপস্থিত বোনদের তার লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনান। তার লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো :

❋ একজন নও মুসলিম নারীর দৃষ্টিতে পর্দা[২৫৩]

ফ্রান্সে অবস্থানকালে আমি ইসলাম গ্রহণ করি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অধিকাংশ জাপানীর মতো আমিও কোনো ধর্মের অনুসারী ছিলাম না। ফ্রান্সে আমি ফরাসি সাহিত্যের ওপরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর লেখাপড়ার জন্যে এসেছিলাম। আমার প্রিয় লেখক ও চিন্তাবিদ ছিলেন সার্তে, নিতশে ও কামাস। এদের সবার চিন্তাধারাই নাস্তিকতা-ভিত্তিক।

ধর্মহীন ও নাস্তিকতা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ ছিলো। আমার অভ্যন্তরীণ কোনো প্রয়োজন নয়, শুধু জানার আগ্রহই আমাকে ধর্ম সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলে। মৃত্যুর পর আমার কী হবে, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা ছিলো না বরং কীভাবে জীবন কাটাবো, এটাই ছিলো আমার আগ্রহের বিষয়। দীর্ঘদিন ধরে আমার মনে হচ্ছিলো—আমি আমার সময় নষ্ট করে চলেছি, যা করার তা কিছুই করছি না। স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা আমার কাছে সমান ছিলো। আমি শুধু সত্যকে জানতে চাইছিলাম। যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকে তাহলে তার সাথে জীবন যাপন করবো, আর যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজে না পাই তাহলে নাস্তিকতার জীবন বেছে নেব; এটাই আমার উদ্দেশ্য।

২৫৩. এ প্রবন্ধটি আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ﵀ রচিত *"ইসলামে পর্দা"* বই থেকে নেওয়া হয়েছে। [ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামে পর্দা*, পৃষ্ঠা : ২৫-৩৭]

ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে আমি পড়াশোনা করতে থাকি। ইসলাম ধর্মকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি। আমি কখনো চিন্তা করিনি, এটা পড়াশোনার যোগ্য কোনো ধর্ম। আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিলো যে, ইসলাম হলো মূর্খ ও সাধারণ মানুষদের এক ধরনের মূর্তিপুজোর ধর্ম। আমি কিছুদিন খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করি। আমি তাদের সাথে বাইবেল অধ্যয়ন করতাম। বেশ কিছুদিন গত হবার পর আমি স্রষ্টার অস্তিত্বের বাস্তবতা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি এক নতুন সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলাম। আমি কিছুতেই আমার অন্তরে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছিলাম না, যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে স্রষ্টা আছে। আমি গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আমি স্রষ্টার অনুপস্থিতিই অনুভব করতে লাগলাম।

তখন আমি বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়ন করতে শুরু করলাম। আশা করছিলাম এ ধর্মের অনুশাসন পালন এবং যোগাভাসের মাধ্যমে আমি স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারবো। খ্রিষ্টান ধর্মের মতো বৌদ্ধ ধর্মেও আমি অনেক কিছু খুঁজে পেলাম, যা সত্য ও সঠিক বলে মনে হলো। কিন্তু অনেক বিষয় আমি বুঝতে ও গ্রহণ করতে পারলাম না। আমার ধারণা ছিলো, স্রষ্টা যদি থাকেন তাহলে তিনি হবেন সকল মানুষের জন্যে এবং সত্য ধর্ম অবশ্যই সবার জন্যে সহজ ও বোধগম্য হবে। আমি বুঝতে পারলাম না, স্রষ্টাকে পেতে হলে কেন মানুষের স্বাভাবিক জীবন পরিত্যাগ করতে হবে।

আমি এক অসহায় অবস্থায় পতিত হলাম। স্রষ্টার সন্ধানে আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা কোনো সমাধানে আসতে পারলো না। এমতাবস্থায় আমি একজন আলজেরীয় মুসলিম মহিলার সাথে পরিচিত হলাম। তিনি ফ্রান্সেই জন্মেছেন, সেখানেই বড়ো হয়েছেন। তিনি নামাজ পড়তেও জানতেন না। তার জীবনযাত্রা ছিলো একজন সত্যিকার মুসলিমের জীবনযাত্রা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু স্রষ্টার প্রতি তার বিশ্বাস ছিলো খুবই দৃঢ়। তার জ্ঞানহীন বিশ্বাস আমাকে বিরক্ত ও উত্তেজিত করে তোলে। আমি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শুরুতেই আমি পবিত্র কুরআনের এক কপি ফরাসি অনুবাদ কিনে আনি। কিন্তু আমি ২ পৃষ্ঠাও পড়তে পারলাম না, কারণ আমার কাছে তা অদ্ভুত মনে হচ্ছিলো।

আমি একা একা ইসলাম বুঝার চেষ্টা ছেড়ে দিলাম এবং প্যারিসের মসজিদে গেলাম, আশা করছিলাম সেখানে আমি কাউকে পাবো যিনি আমাকে সাহায্য করবেন। সেদিন ছিলো রবিবার এবং মসজিদে মহিলাদের একটি আলোচনা চলছিলো। উপস্থিত বোনেরা আমাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন। আমার জীবনে এই প্রথম আমি ধর্ম পালনকারী মুসলিমদের সাথে পরিচিত হলাম। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম যে,

নিজেকে তাদের মধ্যে অনেক সহজ ও আপন বলে অনুভব করতে লাগলাম। অথচ খ্রিষ্টান বান্ধবীদের মধ্যে নিজেকে সর্বদায় আগন্তুক ও দূরাগত বলে অনুভব করতাম।

আমি প্রত্যেক রবিবার তাদের আলোচনায় উপস্থিত হতে লাগলাম। সাথে সাথে মুসলিম বোনদের দেওয়া বইপত্রও পড়তে লাগলাম। এসকল আলোচনার প্রতিটি মুহূর্ত এবং তাদের দেওয়া বই এর প্রতিটি পৃষ্ঠা আমার কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মতো মনে হতে লাগলো। আমার কাছে মনে হচ্ছিলো, আমি সত্যের সন্ধান পেয়ে গেছি। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেজদারত অবস্থায় আমি স্রষ্টাকে আমার অত্যন্ত কাছে অনুভব করতাম।

দুবছর আগে যখন আমি ফ্রান্সে, তখন মুসলিম স্কুলছাত্রীদের উড়না বা স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢাকা নিয়ে ফরাসিদের বিতর্ক তুঙ্গে। অধিকাংশ ফরাসিদের ধারণা ছিলো, ছাত্রীদের মাথা ঢাকার অনুমতি দেওয়া সরকারি স্কুলগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখা চিন্তার বিরোধী। আমি তখনও ইসলাম গ্রহণ করিনি। তবে আমার বুঝতে খুব কষ্ট হোতো, স্কার্ফ রাখার মতো সামান্য একটি বিষয় নিয়ে ফরাসিরা এত অস্থির কেন। দৃশ্যত মনে হচ্ছিল যে, ফ্রান্সের জনগণ তাদের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, বৃহৎ শহরগুলোতে নিরাপত্তাহীনতা, পাশাপাশি আরব দেশগুলো থেকে আসা বহিরাগতদের ব্যাপারে উত্তেজিত ও স্নায়ু পীড়িত হয়ে পড়েছিলো। ফলে তারা তাদের শহরগুলোতে ও স্কুলগুলোতে ইসলামি পোশাক দেখতে চাইছিলো না। অপরদিকে আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে মেয়েদের মধ্যে, বিশেষ করে যুবতীদের মধ্যে ইসলামি হিজাব বা পর্দার দিকে ফিরে আসার জোয়ার এসেছে। অনেক আরব বা মুসলিম এবং অধিকাংশ পাশ্চাত্য জনগণের কাছে এটা ছিলো কল্পনাতীত। কারণ তাদের ধারণা ছিলো যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসারের সাথে সাথে পর্দার বিলুপ্তি ঘটবে। ইসলামি পোশাক ও পর্দা ব্যবহারের আগ্রহ ইসলামি পুনর্জাগরণের একটা অংশ। এর মাধ্যমে আরব ও মুসলিম জনগোষ্ঠীসমূহ তাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট; অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যের মাধ্যমে যে গৌরব বিনষ্ট ও পদদলিত করার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা হচ্ছে।

জাপানী জনগণের দৃষ্টিতে মুসলমানদের পুরোপুরি ইসলাম পালন একধরনের পাশ্চাত্য বিরোধিতা ও প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে রাখার মানসিকতা, যা অনেক আগে জাপানীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। সেই সময়ে তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে এবং পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা ও পোশাক পরিচ্ছদের বিরোধিতা করে। মানুষ সাধারণত ভালো মন্দ বিবেচনা না করেই যেকোনো নতুন বা অপরিচিত বিষয়ের

বিরোধিতা করে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন যে, হিজাব বা পর্দা হচ্ছে মেয়েদের নিপীড়নের একটি প্রতীক। তারা মনে করেন যে, সকল মহিলা পর্দা মেনে চলেন বা চলতে আগ্রহী তারা মূলত প্রচলিত প্রথার দাসত্ব করেন। তাদের বিশ্বাস এ সকল মহিলাদের যদি তাদের ন্যক্কারজনক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা যায় এবং তাদের মধ্যে নারীমুক্তি আন্দোলন ও স্বাধীন চিন্তার আহ্বান সঞ্চারিত করা যায়, তাহলে তারা পর্দা পরিত্যাগ করবে।

এ ধরনের উদ্ভট ও বাজে চিন্তা তারাই করেন, ইসলাম সম্পর্কে যাদের ধারণা খুবই সীমিত। ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্ম বিরোধী চেতনা তাদের মন-মগজকে এমনভাবে গ্রাস করে নিয়েছে যে, তারা ইসলামের সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা বুঝতে একেবারেই অক্ষম। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের সর্বত্র অগণিত অমুসলিম মহিলা ইসলাম গ্রহণ করছে, যাদের মধ্যে আমিও আছি। এর দ্বারা আমরা ইসলামের সর্বজনীনতা বুঝতে পেরেছি।

এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, ইসলামি হিজাব বা পর্দা অমুসলিমদের জন্যে একটি অদ্ভুত বা বিস্ময়কর ব্যাপার। পর্দা শুধু নারীর মাথার চুলই ঢেকে রাখে না, উপরন্তু আরও এমন কিছু আবৃত করে রাখে যেখানে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। আর এজন্যেই তারা খুব অস্বস্তি বোধ করেন। বস্তুত পর্দার অভ্যন্তরে কী আছে, বাইরে থেকে তারা তা মোটেও অনুধাবন করতে পারেন না।

প্যারিসে অবস্থানকালে ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি হিজাব বা পর্দা মেনে চলতাম। আমি একটা স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢেকে নিতাম। পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে একই রঙ এর স্কার্ফ ব্যবহার করতাম। অনেকেই এটাকে একটা নতুন ফ্যাশন ভাবতো। বর্তমানে সৌদি আরবে অবস্থানকালে আমি কালো বোরখায় আমার সমস্ত দেহ আবৃত করে রাখি, এমনকি আমার মুখমণ্ডল ও চোখও। যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারব কি না অথবা পর্দা করতে পারবো কি না, তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবিনি। আসলে নিজেকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাইনি; কারণ আমার ভয় হোতো, হয়তো উত্তর হবে না-সূচক এবং তাতে আমার ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত বিঘ্নিত হবে।

প্যারিসে মসজিদে যাওয়ার আগ মুহূর্তে আমি এমন এক জগতে বাস করেছি, যার সাথে ইসলামের সামান্যতমও সম্পর্ক ছিলো না। সালাত, পর্দা কিছুই আমি চিনতাম না। আমার জন্যে একথা কল্পনা করাও কষ্টকর ছিলো যে, আমি সালাত আদায় করছি বা পর্দা মেনে চলছি। তবে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা আমার এত গভীর ও প্রবল ছিলো

যে, ইসলাম গ্রহণের পরে আমার কী হবে তা নিয়ে আমি ভাবিনি। বস্তুত আমার ইসলাম গ্রহণ ছিলো আল্লাহর অলৌকিক দান। আল্লাহু আকবার!

ইসলামি পোশাক বা হিজাবে আমি নিজেকে নতুনভাবে অনুভব করতে লাগলাম। আমি অনুভব করতে সক্ষম হলাম যে, আমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়েছি। আমি সংরক্ষিত হয়েছি। আমি এও অনুভব করতে লাগলাম যে, আল্লাহ আমার সঙ্গে রয়েছেন। আমি বিদেশিনী হিসেবে অনেক সময় লোকের দৃষ্টির সামনে নিজেকে বিব্রতবোধ করতাম। হিজাব ব্যবহারের ফলে এই অবস্থা কেটে গেল। পর্দা আমাকে এই ধরনের অভদ্র দৃষ্টি থেকে রক্ষা করল। পর্দার মাধ্যমে আমি আনন্দ ও গৌরব অনুভব করতে লাগলাম।

কারণ পর্দা শুধু আল্লাহর প্রতি আমার আনুগত্যের প্রতীকই নয়, উপরন্তু তা মুসলিম নারীদের মাঝে আন্তরিকতার বাঁধন। পর্দার মাধ্যমে আমরা ইসলাম পালনকারী মহিলারা একে অপরকে চিনতে পারি এবং আন্তরিকতা অনুভব করি। সর্বোপরি পর্দা আমার চারপাশের সবাইকে মনে করিয়ে দেয় আল্লাহর কথা। আর আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ আমার সাথে রয়েছেন। পর্দা আমাকে বলে দেয়—সতর্ক হও! একজন মুসলিম নারী হিসেবে যোগ্য কর্ম করো। একজন পুলিশ যেমন ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় তার দায়িত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন থাকে, তেমনি পর্দার মধ্যে আমি মুসলিম হিসেবে নিজেকে বেশি করে অনুভব করতে লাগলাম। আমি যখনই মসজিদে যেতাম, তখনই হিজাব ব্যবহার করতাম। এটা ছিলো সম্পূর্ণ আমার ঐচ্ছিক ব্যাপার, কেউই আমাকে পর্দা করতে চাপ দেয়নি।

আমি ইসলাম গ্রহণের দুই সপ্তাহ পর আমার এক বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে জাপান যাই। সেখানে যাওয়ার পর আমি ফ্রান্সে না ফেরার সিদ্ধান্ত নিই। কারণ ইসলাম গ্রহণের পর ফরাসি সাহিত্যের প্রতি আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। উপরন্তু আরবি ভাষা শেখার প্রতি আমি আগ্রহ অনুভব করতে লাগলাম। মুসলিম পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জাপানের ছোট্ট একটি শহরে একাকী বসবাস করা আমার জন্যে অনেক বড়ো ধরনের পরীক্ষা ছিলো। তবে এ একাকিত্ব আমার মধ্যে মুসলমানিত্বের অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর করে তোলে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলাদের জন্যে শরীর দেখানো পোশাক পরা নিষিদ্ধ। কাজেই আমার আগের মিনিস্কার্ট, হাফহাতা ব্লাউজ ইত্যাদি অনেক পোশাকই আমাকে পরিত্যাগ করতে হলো। এ ছাড়া পাশ্চাত্য ফ্যাশন ইসলামি হিজাব বা পর্দার পরিপন্থী। এজন্যে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, নিজের পোশাক নিজেই তৈরি করবো।

পোশাক তৈরিতে অভিজ্ঞ আমার এক বান্ধবীর সহায়তায় দু সপ্তাহের মধ্যে আমার জন্যে একটি পোশাক তৈরি করে ফেললাম। পোশাকটি ছিলো অনেকটা পাকিস্তানি সেলোয়ার কামিজের মতো। জাপানে ফেরার পর ছমাস এভাবে কেটে গেল। কোনো মুসলিম দেশে গিয়ে আরবি ভাষা ও ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করার আগ্রহ আমার মধ্যে খুবই প্রবল হয়ে উঠলো। এ আগ্রহ বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হলাম। অবশেষে মিশরের রাজধানী কায়রোতে পাড়ি জমালাম।

কায়রোতে কেবল একজন ব্যক্তিকেই আমি চিনতাম। তবে আমার এই মেজবানের পরিবারের কেউই ইংরেজি জানতো না। আমি একেবারেই পাথারে পড়ে গেলাম। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যে-মহিলা আমাকে হাত ধরে বসার জন্যে ভিতরে নিয়ে গেলেন, তিনি কালো কাপড়ে (বোরখায়) তার মুখ ও হাতসহ মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর ঢেকে রেখেছিলেন। এই কালো কাপড় এখন আমার সুপরিচিত এবং বর্তমানে রিয়াদে অবস্থানকালে আমি নিজেও এই পোশাক ব্যাবহার করি। কিন্তু কায়রোতে পৌঁছে আমি এটি দেখে খুবই আশ্চর্য হই।

ফ্রান্সে থাকতে একদিন আমি মুসলমানদের একটা বড়ো ধরনের কনফারেন্সে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং সেখানেই আমি সর্বপ্রথম এই মুখ ঢাকা কালো পোশাক দেখতে পেয়েছিলাম। রঙ-বেরঙের স্কার্ফ ও পোশাক পরা মেয়েদের মাঝে তার পোশাক খুবই বেমানান লাগছিলো। আমি ভাবছিলাম—এই মহিলা মূলত আরব ঐতিহ্য ও আচরণের অন্ধ অনুকরণের ফলেই এই ধরনের পোশাক পড়েছে। ইসলামের সঠিক শিক্ষা তিনি জানতে পারেননি। ইসলাম সম্পর্কে তখনও আমি বিশেষ কিছু জনাতাম না। আমার ধারণা ছিলো—মুখ ঢেকে রাখা একটি আরবীয় অভ্যাস ও আচরণ। ইসলামের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কায়রোর ওই মহিলাটিকে দেখেও আমার অনুরূপ চিন্তাই মনে এসেছিলো। আমার মনে হয়েছিলো—পুরুষদের সাথে সকল প্রকার সংযোগ এড়িয়ে চলার যে প্রবণতা এই মহিলার মধ্যে রয়েছে, তা অস্বাভাবিক।

কালো পোশাক পরা বোন আমাকে জানালো যে, আমার নিজের তৈরি পোশাকটি বাইরে বেরোনোর জন্যে উপযোগী নয়। আমি তার কথা মেনে নিতে পারিনি। কারণ আমার বিশ্বাস ছিলো, একজন মুসলিম নারীর পোশাকের যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, তার সবই আমার ওই পোশাকে ছিলো। তবুও আমি ওই মিশরীয় বোনের মতো ম্যাক্সি ধরনের একটা কালো রঙের কাপড় কিনলাম। উপরন্তু একটি কালো খিমার অর্থাৎ বড়ো ধরনের শরীর জড়ানো চাদরের মতো উড়না কিনলাম, যা দিয়ে আমার শরীরে উপরিভাগ, মাথা ও দুই বাহু আবৃত করে নিলাম। আমি আমার মুখ ঢাকতেও

রাজি ছিলাম, কারণ তাতে বাইরের ধুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো। কিন্তু বোনটি জানালেন—শুধু ধুলো থেকে বাঁচার জন্যে মুখ ঢাকা নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিজে মুখ ঢেকে রাখতেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা ঢেকে রাখা আবশ্যক।

মুখ ঢেকে রাখা যে-সকল বোনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো, কায়রোতে তাদের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। কায়রোর অনেক মানুষ কালো খিমার দেখলেই বিরক্ত বা বিব্রত হয়ে উঠতেন। পাশ্চাত্যের ধাঁচে জীবনযাপনকারী সাধারণ মিশরীয় যুবকেরা এই সকল খিমারে ঢাকা নারীদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। এদেরকে তারা ভগ্নী বলে সম্বোধন করতেন। রাস্তাঘাটে বা বাসে উঠলে সাধারণ মানুষেরা এদেরকে বিশেষ সম্মান দিতেন ও ভদ্রতা দেখাতেন। এ-সকল মহিলা রাস্তাঘাটে একে অপরকে দেখলে সালাম বিনিময় করতেন, তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত কোনো পরিচয় না থাকলেও।

ইসলাম গ্রহণের আগে আমি স্কার্ট এর চেয়ে প্যান্ট বেশি পছন্দ করতাম। কায়রোয় এসে লম্বা ঢিলেঢালা কালো পোশাক পরতে শুরু করলাম। এ পোশাক পরে নিজেকে অনেক ভদ্র ও সম্মানিত বলে মনে হতো। মনে হতো আমি একজন রাজকন্যা। তাছাড়া এ পোশাকে আমি বেশ আরামবোধ করতাম, যা প্যান্ট পরে কখনো অনুভব করিনি। খিমার বা উড়না পরা বোনদেরকে সত্যিই অপূর্ব সুন্দর দেখাতো। তাদের চেহারায় এক ধরনের পবিত্রতা ও সাধুতা ফুটে উঠতো। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মুসলিম নারী বা পুরুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে এবং সেজন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আমি ওই সব মানুষের মানসিকতা মোটেও বুঝতে পারি না, যারা ক্যাথলিক সিস্টারদের ঘোমটা দেখে কিছুই বলেন না, অথচ মুসলিম নারীদের ঘোমটা বা পর্দার সমালোচনায় তারা পঞ্চমুখ। কারণ এটা নাকি নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের প্রতীক!

আমার মিশরীয় বোন আমাকে বলেন যে, আমি যেন জাপানে ফিরে গিয়েও এ পোশাক ব্যবহার করি। এতে আমি অসম্মতি জানাই। আমার ধারণা ছিলো—আমি যদি এ ধরনের পোশাক ব্যবহার করে জাপানের রাস্তায় বেরোই, তাহলে মানুষ আমাকে অভদ্র ও অস্বাভাবিক মনে করবে। পোশাকের কারণে তারা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। আমার কোনো কথাই তারা শুনবে না। আমার বাহির দেখেই তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করবে। আমার মিশরীয় বোনকে আমি এই যুক্তিই দেখিয়েছিলাম।

কিন্তু দুমাসের মধ্যে আমি আমার নতুন পোশাককে ভালোবেসে ফেললাম। তখন

ভাবতে লাগলাম যে, আমি জাপানে গিয়েও এই পোশাকই পরবো। এ উদ্দেশ্যে জাপানে ফেরার কদিন আগে হালকা রঙের ওই জাতীয় কিছু পোশাক এবং কিছু সাদা খিমার তৈরি করলাম। আমার ধারণা ছিলো কালোর চেয়ে এগুলো বেশি গ্রহণযোগ্য হবে জাপানীদের দৃষ্টিতে। আমার সাদা খিমারের ব্যাপারে জাপানীদের প্রতিক্রিয়া ছিলো আমার ধারণার চেয়ে অনেক ভালো। মূলত আমি কোনো রকম প্রত্যাখ্যান বা উপহাসের মুখোমুখি হইনি। মনে হচ্ছিলো জাপানীরা আমার পোশাক দেখে—আমি কোন ধর্মাবলম্বী তা না বুঝলেও—আমার ধর্মানুরাগ বুঝে নিয়েছিলো।

একবার আমি শুনলাম, আমার পিছনে এক মেয়ে তার বান্ধবীকে আস্তে আস্তে বলছে, 'দেখ একজন বৌদ্ধ ধর্ম-যাজিকা'। একবার ট্রেনে যেতে আমার পাশে বসলেন এক মাঝ বয়সী ভদ্রলোক। কেন আমি এমন অদ্ভুত ফ্যাশনের পোশাক পরেছি, তিনি তা জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম, 'আমি একজন মুসলিম। ইসলাম ধর্মে মেয়েদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের দেহ ও সৌন্দর্য আবৃত রাখে। কারণ তাদের অনাবৃত দেহসুষমা ও সৌন্দর্য পুরুষদেরকে আকর্ষিত করে তুলতে পারে। অনেক পুরুষের জন্যে এ ধরনের আকর্ষণ প্রতিরোধ করা কষ্টকর। তাই নারীদের উচিত নয় দেহ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে তাদেরকে বিরক্ত করা বা সমস্যায় ফেলা।' মনে হলো আমার ব্যাখ্যায় তিনি অনেক প্রভাবিত হলেন। ভদ্রলোক সম্ভবত আজকালকার মেয়েদের উত্তেজক ফ্যাশন মেনে নিতে পারছিলেন না। তার নামার সময় হয়েছিলো। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে নেমে গেলেন এবং বললেন—তার একান্ত ইচ্ছা ছিলো ইসলাম সম্পর্কে আরও কিছু জানার কিন্তু সময়ের অভাবে পারলেন না।

গরমকালে রৌদ্রতপ্ত দিনেও আমি পুরো শরীর ঢাকা লম্বা পোশাক ও খিমার পরে বাইরে যেতাম। এতে আমার আব্বা দুঃখ পেতেন। ভাবতেন আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমি দেখলাম রৌদ্রের মধ্যে আমার এ পোশাক খুবই উপযোগী। কারণ এতে মাথা, গলা ও ঘাড় সরাসরি রোদের তাপ থেকে রক্ষা পেতো। উপরন্তু আমার বোনেরা যখন হাফপ্যান্ট পরে চলাফেরা করতো, তখন ওদের সাদা ঊরু দেখে আমি অস্বস্তিবোধ করতাম। অনেক মহিলা এমন পোশাক পরেন, যাতে তাদের বুক ও নিতম্বের আকৃতি পরিষ্কার ফুটে উঠে। ইসলাম গ্রহণের আগেও আমি এ ধরনের পোশাক দেখলে অস্বস্তিবোধ করতাম। আমার মনে হতো—এমন কিছু অঙ্গ প্রদর্শন করা হচ্ছে, যা ঢেকে রাখা উচিত। বের করা উচিত নয়। একজন মেয়ের মনে যদি এ সকল পোশাকে এ ধরনের অস্বস্তি এনে দেয়, তাহলে একজন পুরুষ এ পোশাক পরা মেয়েদের দেখলে কীভাবে প্রভাবিত হবেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আপনারা হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, শরীরের স্বাভাবিক আকৃতি ও প্রকৃতি ঢেকে রাখার দরকার কী? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আসুন একটু ভেবে দেখি। আজ থেকে ৫০ বছর আগে জাপানে মেয়েদের জন্যে সুইমিং স্যুট পরে সুইমিংপুলে সাঁতারকাটা অশ্লীলতা ও অন্যায় বলে মনে করা হোতো। অথচ আজকাল আমরা বিকিনি পরে সাঁতার কাটতেও কোনো লজ্জাবোধ করি না। তবে যদি কোনো মহিলা জাপানের কোথাও শরীরের ঊর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত রেখে সাঁতার কাটেন, তাহলে লোকে তাকে নির্লজ্জ বলবে। আবার দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্র সৈকতে যান, দেখতে পাবেন সেখানে সকল বয়সের অসংখ্য নারী শরীরের ঊর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে টপলেস হয়ে রৌদ্রস্নান করছে। আকেকটু এগিয়ে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে যান, অসংখ্য নগ্নবাদীদেরকে সেখানকার সৈকতে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে রৌদ্রস্নান করতে দেখবেন। যদি একটু পিছিয়ে যান, তাহলে দেখতে পাবেন মধ্যযুগে একজন বৃটিশ নাইট তার প্রিয়তমার জুতোর দৃশ্যতে প্রকম্পিত হয়ে উঠতেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, নারীদেহের গোপন অংশ বা ঢেকে রাখার মতো অংশ কী, সে ব্যাপারে আমাদের মানসিকতা পরিবর্তনশীল।

এখানে আমার প্রশ্ন—আপনি কি একজন নগ্নবাদী? আপনি কি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে চলাফেরা করেন? যদি আপনি নগ্নবাদী হন তাহলে বলুন, যদি কোনো নগ্নবাদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন আপনি আপনার বুক ও নিতম্ব ঢেকে রাখেন, অথচ মুখ ও হাতের ন্যায় বুক ও নিতম্বও তো শরীরের স্বাভাবিক অংশ।' তাহলে আপনি কী বলবেন? আপনি এই প্রশ্নের উত্তরে যা বলবেন, আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি ঠিক সেকথাই বলব। আপনি যেমন শরীরের স্বাভাবিক অংশ হওয়া সত্ত্বেও বুক ও নিতম্বকে গোপনীয় অঙ্গ বলে মনে করেন, আমরা মুসলিম নারীরা মুখমণ্ডল ও হাত ছাড়া সমস্ত শরীরকে গোপনীয় অঙ্গ বলে মনে করি। কারণ মহান স্রষ্টা আল্লাহ এভাবেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

আর এ জন্যেই আমরা মাহরাম ছাড়া অন্যান্য পুরুষের থেকে মুখ ও হাত ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর আবৃত রাখি। আপনি যদি কোনো কিছু লুকিয়ে রাখেন, তাহলে তার মূল্য বেড়ে যাবে। নারীর শরীর আবৃত রাখলে তার আকর্ষণ বেড়ে যায়। এমনকি অন্য নারীর চোখেও তা আকর্ষণীয় হয়ে যায়। পর্দানশীল নারীদের কাঁধ ও গলা অপূর্ব সুন্দর দেখায়। কারণ তা সাধারণত আবৃত থাকে। যখন কোনো মানুষ লজ্জার অনুভূতি হারিয়ে নগ্ন হয়ে রাস্তায় চলাফেরা করেন, প্রকাশ্য জনসমক্ষে প্রস্রাব, পায়খানা ও প্রেম করতে থাকেন, তখন তিনি পশুর সমান হয়ে যান। তাকে আর কোনোভাবেই

পশু থেকে পৃথক করা যায় না। আমার ধারণা লজ্জার অনুভূতি থেকেই মানব সভ্যতা শুরু।

অনেক জাপানী মহিলা শুধু ঘর থেকেই বেরোনোর সময়ই মেকাপ করেন ও সাজগোজ করেন। ঘরে তাদেরকে কেমন দেখাচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামান না। অথচ ইসলামের বিধান হলো, একজন স্ত্রী বিশেষভাবে তার স্বামীর জন্যে নিজেকে সুন্দরী ও আকর্ষণীয় করে রাখতে সচেষ্ট হবেন। অনুরূপভাবে একজন স্বামী তার স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলতে সচেষ্ট হবেন। উপরন্তু লজ্জার অনুভূতি এদের সম্পর্ককে আরও আনন্দময় ও মনোরম করে তোলে। আপনারা হয়তো বলবেন পুরুষদের উত্তেজিত না করার জন্যে আমাদের মুখ হাত ছাড়া বাকী পুরো শরীর ঢেকে রাখাটা বাড়াবড়ি এবং অতি সতর্কতা।

একজন পুরুষ কি শুধু যৌন আগ্রহ নিয়েই নারীর দিকে তাকান? একথা ঠিক যে সব পুরুষই প্রথমেই যৌন আগ্রহ নিয়ে নারীর দিকে তাকান না। তবে নারীকে দেখার পর তার পোশাক ও আচরণ থেকে পুরুষের মনে যে আগ্রহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তা প্রতিরোধ করা তার জন্যে খুবই কষ্টকর। এ ধরনের আবেগ নিয়ন্ত্রণে পুরুষরা বিশেষভাবে দুর্বল। বর্তমান বিশ্বে আলোচিত ধর্ষণ ও যৌন অত্যাচারের পরিমাণ দেখলেই আমরা একথা বুঝতে পারবো।

কেবল পুরুষদের প্রতি মানবিক আবেদন জানিয়ে এবং তাদেরকে আত্মনিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়ে, আমরা ধর্ষণ ও অত্যাচার সমস্যার সমাধান আশা করতে পারি না। পর্দা ছাড়া এগুলো প্রতিরোধের কোনো উপায় নেই। একজন পুরুষ, নারীর পরিধেয় মিনি-স্কার্টের অর্থ এরূপ মনে করতে পারেন—'তুমি চাইলে আমাকে পেতে পারো'। অপরদিকে ইসলামি হিজাব পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়—'আমি তোমার জন্যে নিষিদ্ধ'।

কায়রো থেকে জাপানে গিয়ে আমি তিন মাস সেখানে ছিলাম। এরপর আমি আমার স্বামীর সাথে সৌদি আরবে চলে আসি। শুনেছিলাম যে সৌদি আরবে সব মেয়েকে মুখ ঢাকতে হয়, তাই মুখ ঢাকার জন্যে ছোট একটি কালো কাপড় বা নিকাব আমার সাথে এনেছিলাম। রিয়াদে পৌঁছে দেখলাম এখানে সব মহিলারা মুখ ঢাকেন না। অবশ্যি বিদেশি অমুসলিম মহিলারা শুধু দায়সারাভাবে একটা কালো গাউন পিঠের ওপর ফেলে রাখেন। মুখ মাথা কিছুই ঢাকেন না। বিদেশি মুসলিম মহিলারা অনেকেই মুখ খোলা রাখেন। সৌদি মহিলারা সবাই মুখ সহ আপাদমস্তক ঢেকে চলাফেরা করেন।

রিয়াদে এসে প্রথমবার বাইরে বেরোনোর সময় আমি নিকাব দিয়ে আমার মুখ ঢেকে নিই। বেশ ভালো লাগলো। আসলে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এতে কোনো অসুবিধা বোধ হয় না। বরং আমার মনে হতে লাগলো যে, আমি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছি। কোনো মূল্যবান শিল্প চুরি করে নিয়ে গোপন স্থানে রেখে দিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি আনন্দ অনুভব করছিলাম আমি। অনুভব করছিলাম—আমার এমন একটা মূল্যবান সম্পদ রয়েছে, যা দেখার অনুমতি সবার নেই।

রিয়াদের রাস্তায় একজন মোটাসোটা পুরুষ এবং তার সাথে সর্বাঙ্গ কালো বোরকায় আবৃত একজন মহিলাকে দেখে কোনো বিদেশি হয়তো ভাবেন যে, এই দম্পতির মধ্যে রয়েছে অত্যাচার ও নিপীড়নের সম্পর্ক। মহিলাটি অত্যাচারিত এবং তার স্বামীর দাসীতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোরকা পড়া এই সব মহিলাদের অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা নিজেদেরকে চাকর-বাকরের প্রহরাধীন সম্রাজ্ঞীর মতো মনে করেন।

রিয়াদের প্রথম কমাস আমি আমার নিকাব দিয়ে শুধু চোখের নিচের অংশটুকু ঢাকতাম। চোখ ও কপাল খোলা থাকত। শীতের পোশাক বানাতে গিয়ে আমি একটা চোখঢাকা নিকাব বানিয়ে নিলাম। এবার আমার সাজ পুরো হলো। আমার শান্তি ও তৃপ্তি পূর্ণতা পেলো। এখন আমি ভিড়ের মধ্যে অস্বস্তিবোধ করি না। যখন চোখ খোলা রাখতাম, তখন মাঝেমধ্যে হঠাৎ করে কোনো পুরুষের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলে বিব্রতবোধ করতাম। কালো সানগ্লাসের মতো চোখ ঢাকা নিকাবের ফলে অপরিচিত পুরুষের অনাহূত চোখাচোখি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। একজন মুসলিম মহিলা তার নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্যে নিজেকে আবৃত করে রাখেন। অনাত্মীয় পুরুষের দৃষ্টির অধীনস্থ হতে তিনি রাজি নন। তিনি চান না তাদের উপভোগের সামগ্রী হতে। পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যপন্থী যে-সকল মহিলা তাদের শরীরকে পুরুষের সামনে উপভোগের সামগ্রী হিসেবে তুলে ধরেন, তাদের প্রতি একজন মুসলিম নারী করুণা বোধ করেন।

বাইরে থেকে হিজাব বা পর্দা দেখে এর ভিতরে কী আছে, তা আদৌ বুঝা সম্ভব নয়। বাইরে থেকে পর্দা ও পর্দাশীনদের পর্যবেক্ষণ করা, আর পর্দার মধ্যে জীবন কাটানো—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। দুটো বিষয়ের মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে, মূলত সেখানে আছে ইসলামকে বোঝার গ্যাপ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ইসলাম একটি জেলখানা, এখানে কোনো স্বাধীনতা নেই। কিন্তু আমরা যারা এর মধ্যে অবস্থান করছি—আমরা এত শান্তি, আনন্দ ও স্বাধীনতা অনুভব করছি যা ইসলাম

গ্রহণের আগে কখনোই করিনি। পাশ্চাত্যের তথাকথিত স্বাধীনতা পায়ে ঠেলে আমরা ইসলামকে বেছে নিয়েছি। একথা যদি সত্য হতো যে, ইসলাম মেয়েদের নিপীড়ন করেছে এবং তাদের অধিকার খর্ব করেছে, তাহলে ইউরোপ আমেরিকা, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের অগণিত মেয়ে কেন তাদের সকল স্বাধীনতা ও স্বাধিকার পায়ে ঠেলে ইসলাম গ্রহণ করছে? আশা করি সবাই বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা বা ভ্রান্ত পূর্বধারণার কারণে যদি কেউ অন্ধ না হন, তাহলে তিনি অবশ্যই দেখবেন—একজন পর্দানশীল মহিলা কী অপূর্ব সুন্দর। তার মধ্যে ফুটে উঠেছে স্বর্গীয় সৌন্দর্য, দেবীত্বের প্রতীক ও সতীত্বের আভা। আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদায় উদ্ভাসিত তার চেহারা। অত্যাচারের বা নিপীড়নের সামান্যতম কোনো চিহ্নও আপনি তার চেহারায় পাবেন না। এটা জ্বলন্ত সত্য। কিন্তু তারপরও অনেকে তা দেখতে পান না। কেন? সম্ভবত তারা ওই ধরনের মানুষ, যারা আল্লাহর নিদর্শন দেখেও, জেনেও অস্বীকার করেন। প্রচলিত প্রথার দাসত্ব, বিদ্বেষ, ভ্রান্তধারণা ও স্বার্থের অন্বেষণ যাদেরকে অন্ধ করে ফেলেছে। ইসলামের সত্যকে অস্বীকার করার এ ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে?

দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে ভ্রান্তি থেকে। কাজেই যে ব্যক্তি তাগুতকে (মিথ্যা উপাস্য) অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, অবশ্যই সে আঁকড়ে ধরল এমন মজবুত রশি যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

[আল কুরআন, (২) : ২৫৬]